BDeBooks.com

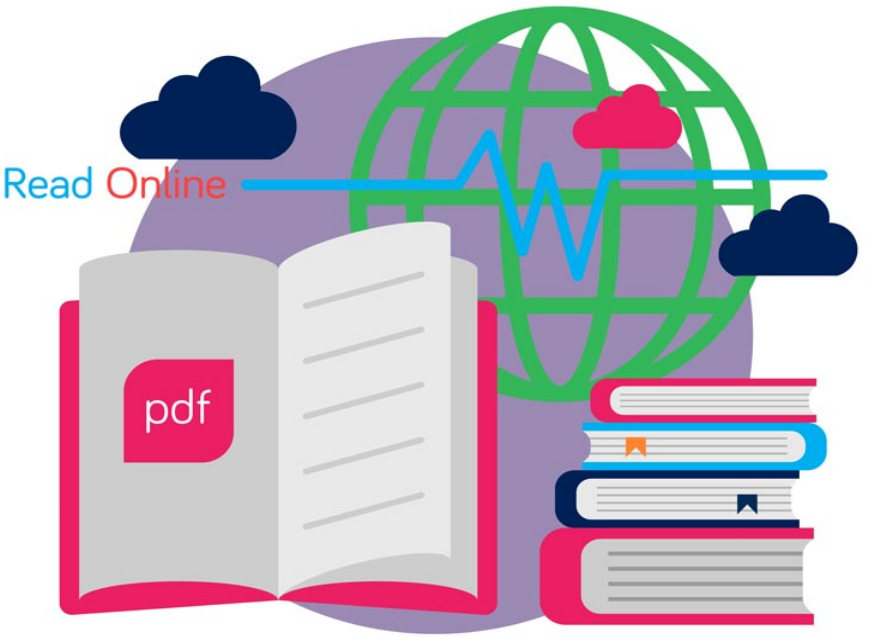

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

www.BDeBooks.Com

প্রোফেসর শঙ্কু ও রোবু

১৬ই এপ্রিল

আজ জার্মানি থেকে আমার চিঠির উত্তরে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রোফেসর পমারের চিঠি পেয়েছি। পমার লিখছেন—

প্রিয় প্রোফেসর শঙ্কু,

তোমার তৈরি রোবো (Robot) বা যান্ত্রিক মানুষ সম্বন্ধে তুমি যা লিখেছ, তাতে আমার যত না আনন্দ হয়েছে, তার চেয়েও বেশি হয়েছে বিস্ময়। তুমি লিখেছ আমার রোবো সম্পর্কে গবেষণামূলক লেখা তুমি পড়েছ, আর তা থেকে তুমি অনেক জ্ঞান লাভ করেছ। কিন্তু তোমার রোবো যদি সত্যিই তোমার বর্ণনার মতো হয়ে থাকে, তা হলে বলতেই হবে যে আমার কীর্তিকে তুমি অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছ।

আমার বয়স হয়েছে, তাই আমার পক্ষে ভারতবর্ষে পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু তুমি যদি একটিবার তোমার তৈরি মানুষটিকে নিয়ে আমার এদিকে আসতে পার, তা হলে আমি শুধু খুশিই হব না, আমার উপকারও হবে। এই হাইডেলবার্গেই আমারই পরিচিত আরেকটি বৈজ্ঞানিক আছেন—ডক্টর বোর্গেন্ট। তিনিও রোবো নিয়ে কিছু কাজ করেছেন। হয়তো তাঁর সঙ্গেও তোমার আলাপ করিয়ে দিতে পারব।

তোমার উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম। যদি আসতে রাজি থাক, তা হলে একদিকের ভাড়াটার আমি নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করে দিতে পারব। আমার এখানেই তোমার থাকার ব্যবস্থা হবে, বলাই বাহুল্য।

ইতি
রুডল্‌ফ পমার

পমারের চিঠির উত্তর আজই দিয়ে দিয়েছি। বলেছি আগামী মাসের মাঝামাঝি আসব। ভাড়ার ব্যাপারে আর আপত্তি করলাম না, কারণ জার্মানি যাতায়াতের খরচা কম নয়, অথচ ওদেশটা দেখার লোভও আছে যথেষ্ট।

আমার রোবু সঙ্গে যাবে অবশ্যই, তবে ও এখনও বাংলা আর ইংরিজি ছাড়া কিছু বলতে পারে না। এই একমাসে জার্মানটা শিখিয়ে নিলে ও সরাসরি পমারের সঙ্গে কথা বলতে পারবে ; আমাকে আর দোভাষীর কাজ করতে হবে না।

রোবুকে তৈরি করতে আমার সময় লেগেছে দেড় বছর। আমার চাকর প্রহ্লাদ সব সময় আমার পাশে থেকে জিনিসপত্র এগিয়েটেগিয়ে দিয়ে সাহায্য করেছে, কিন্তু আসল কাজটা সমস্ত আমি নিজেই করেছি। আর যেটা সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, সেটা হচ্ছে রোবুকে তৈরি করার খরচ। সবসুদ্ধ মিলিয়ে খরচ পড়েছে মাত্র তিনশো তেত্রিশ টাকা সাড়ে সাত আনা। এই সামান্য টাকায় যে জিনিসটা তৈরি হল সেটা ভবিষ্যতে হবে আমার ল্যাবরেটরির সমস্ত কাজে আমার সহকারী, যাকে বলে রাইট হ্যান্ড ম্যান। সাধারণ যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের অঙ্ক কষতে রোবুর লাগে এক সেকেন্ডের কম সময়। এমন কোনও কঠিন অঙ্ক নেই যেটা করতে

ওর দশ সেকেন্ডের বেশি লাগবে। এ থেকে বোঝা যাবে আমি জলের দরে কী এক আশ্চর্য জিনিস পেয়ে গেছি। 'পেয়ে গেছি' বলছি এই জন্যে যে, কোনও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকেই আমি সম্পূর্ণ মানুষের সৃষ্টি বলে মনে করতে পারি না। সম্ভাবনাটা আগে থেকেই থাকে, হয়তো চিরকালই ছিল; মানুষ কেবল হয় বুদ্ধির জোরে না হয় ভাগ্যবলে সেই সম্ভাবনাগুলোর হদিস পেয়ে সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে নেয়।

রোবুর চেহারাটা যে খুব সুশ্রী হয়েছে তা বলতে পারি না। বিশেষ করে দুটো চোখ দুরকম হয়ে যাওয়াতে ট্যারা বলে মনে হয়। সেটাকে ব্যালান্স করার জন্য আমি রোবুর মুখে একটা হাসি দিয়ে দিয়েছি। যতই কঠিন অঙ্ক করুক না সে—হাসিটা ওর মুখে সব সময় লেগে থাকে। মুখের জায়গায় একটা ফুটো দিয়ে দিয়েছি, কথাবার্তা সব ওই ফুটো দিয়ে বেরোয়। ঠোঁট নাড়ার ব্যাপারটা করতে গেলে অযথা সময় আর খরচ বেড়ে যেত তাই ওদিকে আর যাইনি।

মানুষের যেখানে ব্রেন থাকে, সেখানে রোবুর আছে একগাদা ইলেক্‌ট্রিক তার, ব্যাটারি, ভ্যাল্‌ভ ইত্যাদি। কাজেই ব্রেন যা কাজ করে, তার অনেকগুলোই রোবু পারে না। যেমন সুখ দুঃখ অনুভব করা, বা কারুর ওপর রাগ করা বা হিংসে করা—এসব রোবু জানেই না। ও কেবল কাজ করে আর প্রশ্নের উত্তর দেয়। অঙ্ক সব রকমই পারে, তবে শেখানো কাজের বাইরে কাজ করে না, আর শেখানো প্রশ্নের জবাব ছাড়া কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। পঞ্চাশ হাজার ইংরিজি আর বাংলা প্রশ্নের উত্তর ওকে শিখিয়েছি—একদিনও ভুল করেনি। এবার হাজার দশেক জার্মান প্রশ্নের উত্তর শিখিয়ে দিলেই আমি জার্মানি যাবার জন্য তৈরি হয়ে যাব।

এত অভাব থেকে রোবু যা করে তা পৃথিবীর আর কোনও যান্ত্রিক মানুষ করেছে বলে মনে হয় না। এমন একটা জিনিস সৃষ্টি করে গিরিডি শহরের মধ্যে সেটাকে বন্দি করে রাখার কি কোনও মানে হয়? বাংলাদেশে সামান্য রসদে বাঙালি বৈজ্ঞানিক কী করতে পারে, সেটা কি বাইরের জগতের জানা উচিত নয়? এতে নিজের প্রচারের চেয়ে দেশের প্রচার বেশি। অন্তত আমার উদ্দেশ্য সেটাই।

১৮ই এপ্রিল

অ্যাদ্দিনে অবিনাশবাবু আমার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা স্বীকার করলেন। আমার এই প্রতিবেশীটি ভাল মানুষ হলেও, আমার কাজ নিয়ে তাঁর ঠাট্টার ব্যাপারটা মাঝে মাঝে বরদাস্ত করা মুশকিল হয়।

উনি প্রায়ই আমার সঙ্গে আড্ডা মারতে আসেন—কিন্তু গত তিনমাসের মধ্যে যতবারই এসেছেন, ততবারই আমি প্রহ্লাদকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছি যে আমি ব্যস্ত, দেখা হবে না।

আজ রোবুকে জার্মান শিখিয়ে আমার ল্যাবরেটরির চেয়ারে বসে একটা বিজ্ঞান পত্রিকার পাতা উলটোচ্ছি, এমন সময় উনি এসে হাজির। আমার নিজেরও ইচ্ছে ছিল উনি একবার রোবুকে দেখেন, তাই ভদ্রলোককে বৈঠকখানায় না বসিয়ে একেবারে ল্যাবরেটরিতে ডেকে পাঠালাম।

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকেই নাক সিঁটকিয়ে বললেন, 'আপনি কি হিং-এর কারবার ধরেছেন নাকি?' পরমুহূর্তেই রোবুর দিকে চোখ পড়তে নিজের চোখ গোল গোল করে বললেন, 'ওরে বাস্‌—ওটা কী? ওকি রেডিও, না কলের গান, না কী মশাই?'

অবিনাশবাবু এখনও গ্রামোফোনকে বলেন কলের গান, সিনেমাকে বলেন বায়স্কোপ,

www.BDeBooks.Com

এরোপ্লেনকে বলেন উড়োজাহাজ।

আমি ওঁর প্রশ্নের উত্তরে বললাম, 'ওকেই জিজ্ঞেস করুন না ওটা কী। ওর নাম রোবু।'

'রোবুস্কোপ?'

'রোবুস্কোপ কেন হতে যাবে? বলছি না ওর নাম রোবু! আপনি ওর নাম ধরে জিজ্ঞেস করুন ওটা কী জিনিস, ও ঠিক জবাব দেবে।'

অবিনাশবাবু 'কী জানি বাবা এ আপনার কী খেলা' বলে যন্ত্রটার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তুমি কী হে রোবু?'

রোবুর মুখের গর্ত থেকে পরিষ্কার উত্তর এল, 'আমি যান্ত্রিক মানুষ। প্রোফেসর শঙ্কুর সহকারী।'

ভদ্রলোকের প্রায় ভিরমি লাগার জোগাড় আর কী। রোবু কী কী করতে পারে শুনে, আর তার কিছু কিছু নমুনা দেখে অবিনাশবাবু একেবারে ফ্যাকাশে মুখ করে আমার হাত দুটো ধরে কয়েকবার ঝাঁকুনি দিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। বুঝলাম এবার তিনি সত্যিই ইম্প্রেস্ড।

আজ একটা পুরনো জার্মান বিজ্ঞানপত্রিকায় প্রোফেসর বোর্গেল্টের লেখা রোবো সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ হঠাৎ চোখে পড়ে গেল। উনি বেশ দেমাকি মেজাজেই লিখেছেন যে, যান্ত্রিক মানুষ তৈরির ব্যাপারে জার্মানরা যা কৃতিত্ব দেখিয়েছে, তেমন আর কোনও দেশে কেউ দেখায়নি। তিনি আরও লিখেছেন যে, যান্ত্রিক মানুষকে দিয়ে চাকরবাকরের মতো কাজ করানো সম্ভব হলেও, তাকে দিয়ে কাজের কাজ বা বুদ্ধির কাজ কোনওদিনই করানো যাবে না।

প্রোফেসর বোর্গেল্টের একটা ছবিও প্রবন্ধটার সঙ্গে রয়েছে। প্রশস্ত ললাট, ভুরু দুটো অস্বাভাবিক রকম ঘন, চোখ দুটো কোটরে ঢোকা, আর থুতনির মাঝখানে একটা দু ইঞ্চি আন্দাজ লম্বা আর সেই রকমই চওড়া প্রায় চারকোনা কালো দাড়ির চাবড়া।

ভদ্রলোকের লেখা পড়ে আর তাঁর চেহারা দেখে তাঁর সঙ্গে দেখা করার আগ্রহটা আরও বেড়ে গেল।

২৩শে মে

আজ সকালে হাইডেলবার্গ পৌঁছেছি। ছবির মতো সুন্দর শহর, ইউরোপের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থিতির জন্য প্রসিদ্ধ। নেকার নদী শহরের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে, পেছনে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে সবুজ বনে ঢাকা পাহাড়। এই পাহাড়ের উপর রয়েছে হাইডেলবার্গের ঐতিহাসিক কেল্লা।

শহর থেকে পাঁচ মাইল বাইরে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রোফেসর পমারের বাসস্থান। সত্তর বছরের বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক আমাকে যে কী খাতির করলেন তা বলে বোঝানো যায় না। বললেন, 'ভারতবর্ষের প্রতি জার্মানির একটা স্বাভাবিক টান আছে জান বোধ হয়। আমি তোমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্য দর্শন ইত্যাদির অনেক বই পড়েছি। ম্যাক্স মূলার এসব বইয়ের চমৎকার অনুবাদ করেছেন। তাঁর কাছে আমরা বিশেষভাবে ঋণী। তুমি একজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক হয়ে আজ যে কাজ করেছ, তাতে আমাদের দেশেরও গৌরব বাড়ল।'

রোবুকে তার সাইজ অনুযায়ী একটা প্যাকিংকেসে খড়, তুলো, করাতের গুঁড়ো ইত্যাদির মধ্যে খুব সাবধানে শুইয়ে নিয়ে এসেছিলাম। পমারের তাকে দেখার জন্য খুবই কৌতূহল হচ্ছে জেনে আমি দুপুরের মধ্যেই তাকে বাক্স থেকে বার করে ঝেড়ে পুঁছে পমারের

ল্যাবরেটরিতে দাঁড় করালাম। পমার এ জিনিসটি নিয়ে এত গবেষণা এত লেখালেখি করলেও নিজে কোনওদিন রোবো তৈরি করেননি।

রোবুর চেহারা দেখে তাঁর চোখ কপালে উঠে গেল। বললেন, 'এ যে তুমি দেখছি আঠা, পেরেক, আর স্টিকিং প্লাস্টার দিয়েই সব জোড়ার কাজ সেরেছ! তুমি বলছ এই রোবো কথা বলে, কাজ করে?'

পমারের গলায় অবিশ্বাসের সুর অতি স্পষ্ট।

আমি একটু হেসে বললাম, 'আপনি ওকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। ওকে প্রশ্ন করুন না।'

পমার রোবুর দিকে ফিরে বললেন, 'Welche arbeit machst du? (তুমি কী কাজ কর?)'

রোবু স্পষ্ট গলায় স্পষ্ট উচ্চারণে উত্তর দিল, 'Ich helfe meinem herrn bei seiner arbeit, und lose mathematische probleme (আমি আমার মনিবের কাজে সাহায্য করি, আর অঙ্কের সমস্যার সমাধান করি)।'

পমার রোবুর দিকে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে কিছুক্ষণ মাথা নাড়লেন। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'শঙ্কু, তুমি যা করেছ, বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার কোনও তুলনা নেই। বোর্গেল্টের ঈর্ষা হবে।'

এর আগে বোর্গেল্ট সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কোনও কথা হয়নি। হঠাৎ পমারের মুখে তাঁর নাম শুনে একটু চমকেই গেলাম। বোর্গেল্টও কি নিজে কোনও রোবো তৈরি করেছেন নাকি?

আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই পমার বললেন, 'বোর্গেল্ট হাইডেলবার্গেই আছে—আমারই মতো নির্জন পরিবেশে, তবে নদীর ওপারে। আমার সঙ্গে আগে যথেষ্ট আলাপ ছিল—বন্ধুত্বই বলতে পারো। একই স্কুলে পড়েছি বার্লিনে—তবে ওর চেয়ে আমি তিন বছরের সিনিয়র ছিলাম। তারপর আমি হাইডেলবার্গে এসে ডিগ্রী পড়ি। ও বার্লিনেই থেকে যায়। বছর দশেক হল ও এখানে এসে ওদের পৈতৃক বাড়িতে রয়েছে।'

'উনি কি নিজে রোবো তৈরি করেছেন?'

'অনেকদিন থেকেই লেগে আছে—কিন্তু বোধ হয় সফল হয়নি। মাঝে তো শুনেছিলাম ওর মাথাটা একটু বিগড়েই গেছে। গত ছ'মাস ও বাড়ি থেকে বেরোয়নি। আমি টেলিফোনে কথা বলার চেষ্টা করেছি কয়েকবার, প্রতিবারই ওর চাকর বলেছে বোর্গেল্ট অসুস্থ। ইদানীং আর ফোনটোন করিনি।'

'আমি এসেছি সেটা কি উনি জানেন?'

'তা তো বলতে পারি না। তুমি আসছ সেকথা এখানকার কয়েকজন বৈজ্ঞানিককে আমি বলেছি—তাদের সঙ্গে তোমার দেখাই হবে। খবরের কাগজের লোকও কেউ কেউ জেনে থাকতে পারে। বোর্গেল্টকে আর আলাদা করে জানাবার প্রয়োজন দেখিনি।'

আমি চুপ করে রইলাম। দেয়ালে একটা কুকু ক্লকে কুক কুক করে চারটে বাজল। খোলা জানালার বাইরে বাগান দেখা যাচ্ছে; তারও পিছনে পাহাড়। দু-একটা পাখির ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

পমার বললেন, 'রাশিয়ার স্ট্রেগোনাফ, আমেরিকার প্রোফেসর স্টাইনওয়ে, ইংলন্ডের ডাঃ ম্যানিংস—এঁরা সকলেই রোবো তৈরি করেছেন। জার্মানিতেও তিন-চারটে রোবো তৈরি হয়েছে—আর সেগুলো সবই আমি দেখেছি। কিন্তু তাদের কোনওটাই এত সহজে তৈরি হয়নি, আর এমন স্পষ্ট কথাও বলতে পারে না।'

আমি বললাম, 'ও কিন্তু অঙ্কও করতে পারে। ওকে যে কোনও অঙ্ক দিয়ে আপনি পরীক্ষা

www.BDeBooks.Com

করে দেখতে পারেন।'

পমার অবাক হয়ে বললেন, 'বলো কী ! ও আউয়েরবাখের ইকুয়েশন জানে ?'

'জিজ্ঞেস করে দেখুন।'

রোবুকে পরীক্ষা করে পমার বললেন, 'এ একেবারে তাজ্জব কাণ্ড। সাবাস তোমার প্রতিভা।' তারপর একমুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'তোমার রোবু কি মানুষের মতো অনুভব করতে পারে ?'

আমি বললাম, 'না—ও জিনিসটা ও পারে না।'

পমার বললেন, 'আর কিছু না হোক, তোমার ব্রেনের সঙ্গে ওর যদি একটা সংযোগ থাকত তা হলে খুব ভাল হত। অন্তত তোমার সুখ দুঃখ যদি ও বুঝতে পারত তা হলে ওকে দিয়ে তোমার অনেক উপকার হতে পারত। ও সত্যিই তা হলে তোমার একজন নির্ভরযোগ্য সাথী হতে পারত।'

পমার যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। তারপর বললেন, 'আমি ওই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি—একটা যান্ত্রিক মানুষকে কী করে একটা রক্ত-মাংসের মানুষের মনের কথা বোঝানো যায়। এ নিয়ে অনেক দূর আমি এগিয়েও ছিলাম, কিন্তু তারপর বুড়ো হয়ে পড়লাম। ব্রেনটা ঠিকই ছিল, কিন্তু হৃদরোগ ধরে কাবু করে দিল। আর, যে রোবোর উপর এইসব পরীক্ষা চালাব, সেটা তৈরি করারও আমার সামর্থ্য রইল না।'

আমি বললাম, 'আমি রোবুর কাজে দিব্যি খুশি আছি। ও যতটুকু করে তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।'

পমার কিছু বললেন না। তিনি দেখি একদৃষ্টে রোবুর দিকে চেয়ে আছেন। রোবুর মুখে সেই হাসি। ঘরের জানালা দিয়ে পড়ন্ত রোদ ঢুকে রোবুর বাঁ চোখটার উপর পড়েছে। রোদের ঝলসানিতে ইলেক্‌ট্রিকের বাল্‌বের চোখও মনে হয় হাসছে।

২৪শে মে

এখন রাত বারোটা। আমি পমারের বাড়ির দোতলার ঘরে বসে আমার ডায়রি লিখছি। গতকাল মাঝরাত্তির থেকে আরম্ভ করে আজ সারাদিনের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে, যেগুলো সব গুছিয়ে লেখার চেষ্টা করছি। কতদূর পারব তা জানি না, কারণ আমার মন ভাল নেই। জীবনে আজ প্রথম আমার মনে সন্দেহ জেগেছে যে আমি নিজেকে যত বড় বৈজ্ঞানিক বলে মনে করেছিলাম, সত্যিই আমি তত বড় কি না। তাই যদি হতাম, তা হলে এভাবে অপদস্থ হলাম কেন ?

কাল রাত্রের ঘটনাটাই আগে বলি। এটা তেমন কিছু না, তবু লিখে রাখা ভাল।

রাত্রে পমার আর আমি ডিনার শেষ করে উঠেছি ন'টায়। তারপর দুজনে বৈঠকখানায় বসে কফি খেতে খেতে অনেক গল্প করেছি। তখনও পমারকে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে দেখেছি। কী ভাবছিলেন কে জানে। হয়তো রোবুকে দেখা অবধি ওঁর নিজের অক্ষমতার কথাটা বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে। সত্যিই, উনি যে রকম বুড়ো হয়ে গেছেন, তাতে ওঁর পক্ষে আর রোবো নিয়ে নতুন করে কোনও গবেষণা করা সম্ভব বলে মনে হয় না।

আমি শুতে গেছি দশটার কিছু পরে। যাবার আগে রোবুকে দেখে গেছি। পমারের ল্যাবরেটরিতে ও দিব্যি আরামে আছে বলেই মনে হল। জার্মানির আবহাওয়া, এখানকার শীত ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—এসবের প্রতি ওর কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই। ও যেন শুধু অপেক্ষা

করে আছে আমার আদেশের জন্য। ঘুমোতে যাবার আগে আমরা দুই বৈজ্ঞানিক জার্মান ভাষায় ওর কাছে বিদায় নিলাম। রোবুও পরিষ্কার গলায় বলল, 'গুটে নাখ্ট্, হের্ প্রোফেসর শঙ্কু—গুটে নাখ্ট হের্ প্রোফেসর পমার।'

বিছানার পাশের বাতি জ্বালিয়ে কিছুক্ষণ একটা ম্যাগাজিন উলটে পালটে ঢং ঢং করে নীচের সিঁড়ির গ্রান্ডফাদার ঘড়িতে এগারোটা বাজা শুনে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়েছি।

মাঝরাত্তিরে যখন ঘুম ভেঙেছে তখন কটা বেজেছে জানি না। ঘুমটা ভেঙেছে একটা আওয়াজ শুনেই—আর সে আওয়াজটা আসছে আমার ঘরের ঠিক নীচে পমারের ল্যাবরেটরি থেকে। খট খট খট ঠং ঠং—খট খট। একবার মনে হচ্ছে কাঠের মেঝের উপর মানুষের পায়ের আওয়াজ, আরেকবার মনে হচ্ছে যন্ত্রপাতি ঘাঁটাঘাঁটির শব্দ।

তবে আওয়াজটা পাঁচ মিনিটের বেশি আর শুনতে পেলাম না। তাও বেশ কিছুক্ষণ কান খাড়া করে শুয়ে রইলাম—যদি আরও কোনও শব্দ হয়। কিন্তু তারপরে ঘড়িতে তিনটে বাজার শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনিনি।

সকালে ব্রেকফাস্টের সময় পমারকে আর এ বিষয়ে কিছু বললাম না। কারণ আমার ঘুমের কোনওরকম ব্যাঘাত হয়েছে শুনে উনি হয়তো ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়বেন।

ব্রেকফাস্টের পর একটু বেড়াতে যাব বলে ঠিক করেছিলাম, কিন্তু টেবিল ছেড়ে ওঠার আগেই পমারের চাকর কুর্ট এসে একটা ভিজিটিং কার্ড তার মনিবের হাতে দিল। নাম পড়ে পমার অবাক হয়ে বললেন, 'সে কী; বোর্গেল্ট এসেছে দেখছি!'

আমিও খবরটা জেনে রীতিমতো অবাক হলাম।

বৈঠকখানায় গিয়ে দেখি, গিরিডিতে থাকতে জার্মান পত্রিকার ছবিতে যে মুখ দেখেছিলাম, এ সে-ই মুখ, কেবল চুলে আরও অনেক বেশি পাক ধরেছে। আমরা ঢুকতেই বোর্গেল্ট সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের অভিবাদন জানালেন। এত বয়স সত্ত্বেও তাঁর চটপটে মিলিটারি ভাব দেখে আশ্চর্য লাগল। এঁরও তো প্রায় সত্তরের কাছাকাছি বয়স—কিন্তু কী জোয়ান স্বাস্থ্য!

পমার বললেন, 'কই, বোর্গেল্ট, তোমাকে দেখে তো লম্বা অসুখ থেকে উঠেছ বলে মোটেই বোধ হচ্ছে না—বরং মনে হচ্ছে চেঞ্জে গিয়ে শরীর সারিয়ে এসেছ।'

বোর্গেল্ট ভারী গলায় হো হো করে হেসে বললেন, 'অসুখ বললে লোকে উৎপাতটা কম করে; ব্যস্ত আছি বললে অনেক সময়েই কাজ হয় না—বরং লোকের তাতে কৌতূহলটা বেড়েই যায়, আর তখন তারা টেলিফোন করে বার বার জানতে চায় ব্যস্ততার কারণ কী। বুঝতেই পারছ সে কারণটা সব সময় বলা যায় না।'

'তা অবিশ্যি যায় না।'

পমার বোর্গেল্টকে পানীয় অফার করতে ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, 'ও জিনিসটা একদম ছেড়ে দিয়েছি, আর আমার সময়ও খুব বেশি নেই। আমি আজকের খবরের কাগজে রোবো সহ প্রোফেসর শঙ্কুর এখানে আসার কথা পড়লাম। ও ব্যাপারে আমার কীরকম কৌতূহল সে তো জানোই। তাই খবর না দিয়েই একেবারে সটান চলে এলাম। আশা করি কিছু মনে করনি।'

'না, না।'

আমি বললাম, 'আপনি বোধ হয় তা হলে আমার যন্ত্রটা একবার দেখতে চান।'

'সেই জন্যেই তো আসা। আপনি কীভাবে অসম্ভবকে সম্ভব করলেন সেটা জানার স্বভাবতই একটা আগ্রহ হচ্ছে।'

বোর্গেল্টকে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে এলাম।

www.BDeBooks.Com

রোবুকে দেখেই বোর্গেল্টের প্রথম কথা হল, 'আপনি বোধ হয় চেহারাটার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেননি। আমার মনে হয় এ জিনিসটাকে যান্ত্রিক মানুষ না বলে কেবল যন্ত্র বলাই ভাল—তাই নয় কি ?'

এটা অবিশ্যি আমি অস্বীকার করতে পারলাম না। বললাম, 'আমি কাজের উপরই জোরটা দিয়েছি বেশি—সেটা ঠিক। অ্যাপোলোর মতো নিখুঁত সুদর্শন মানুষ ওকে নিশ্চয়ই বলা চলে না।'

'আপনার রোবো ভাল অঙ্ক কষতে পারে শুনেছি !'

'টেস্ট করবেন ?'

বোর্গেল্ট রোবুর দিকে ফিরে বললেন, 'দুইয়ে দুইয়ে কত হয় ?'

উত্তরটা রোবুর মুখ থেকে এত জোরে এল যে পমারের ল্যাবরেটরির কাচের জিনিসপত্র সব ঝনঝন করে উঠল। এত জোরে রোবু কখনও কথা বলে না। স্পষ্ট বুঝলাম—আর বুঝে একটু অবাক হলাম যে, বোর্গেল্টের প্রশ্নে রোবু বিরক্ত হয়েছে।

বোর্গেল্টের নিজের হাবভাবও এই দাবড়ানির চোটে একটু আড়ষ্ট বলে মনে হল। তিনি একের পর এক কঠিন অঙ্কের প্রশ্ন রোবুকে করতে লাগলেন, আর রোবুও যথারীতি পাঁচ থেকে সাত সেকেন্ডের মধ্যে প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেল। গর্বে আমার বুকটা ফুলে উঠল। বোর্গেল্টের দিকে চেয়ে দেখি এই চল্লিশ ডিগ্রি শীতের মধ্যেও তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে।

প্রায় পাঁচ মিনিট প্রশ্ন করার পর বোর্গেল্ট আমার দিকে ফিরে বললেন, 'অঙ্ক ছাড়া আর কী জানে ও ?'

আমি বললাম, 'আপনার বিষয়ে ওর অনেক তথ্য জানা আছে—জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।'

আসবার আগে একটা জার্মান বিজ্ঞানকোষ থেকে বোর্গেল্ট-এর জীবন সংক্রান্ত অনেক খবর রোবুর মধ্যে 'পুরে' দিয়েছিলাম। আমি আন্দাজ করেছিলাম যে, বোর্গেল্ট রোবুকে প্রশ্ন করতে পারেন।

বোর্গেল্ট আমার কথা শুনে যেন বেশ একটু অবাক হলেন। তারপর বললেন, 'এত জ্ঞান আপনার যন্ত্রের ? বেশ, বলো তো হের্ রোবু...আমার নামটি কী।'

রোবুর মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। এক সেকেন্ড, দু সেকেন্ড, দশ সেকেন্ড, এক মিনিট—কোনও উত্তর নেই, কোনও শব্দ নেই, কোনও কিচ্ছু নেই। রোবু যেন ঘরের আর সব টেবিল চেয়ার আলমারি যন্ত্রপাতির মতোই নিষ্প্রাণ, নির্জীব।

এবারে আমার ঘাম ছোটার পালা। আমি এগিয়ে রোবুর মাথার উপরের বোতামটা নিয়ে টেপাটেপি করলাম, এটা নাড়লাম, ওটা নাড়লাম—এমনকী রোবুর সমস্ত শরীরটাকে নিয়ে বারবার ঝাঁকুনি দিলাম—ভিতরের কলকবজা সব ঝনঝন করে উঠল— কিন্তু কোনও ফল হল না।

রোবু আজ আমার এবং ভারতীয় বিজ্ঞানের সমস্ত মানসম্মান এই দুই বিখ্যাত বিদেশি বৈজ্ঞানিকের সামনে মাটিতে মিশিয়ে দিল।

বোর্গেল্ট মুখ দিয়ে হুঁঃ করে একটা শব্দ করে বললেন, 'ওটায় যে একটা বড় রকম ডিফেক্ট রয়ে গেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। যাই হোক—অঙ্কটা ও ভালই জানে। যদি অসুবিধা না হয়, কাল বিকেলে ওটাকে নিয়ে একবার আমার বাড়িতে গেলে আমি সারিয়ে দিতে পারব বলে মনে হয়। আর আমারও কিছু দেখাবার আছে। তোমাদের দুজনেরই নেমন্তন্ন রইল।'

বোর্গেল্ট বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

পমার আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন, আর আমিও বুঝতে পারছিলাম তিনি নিজেও খুব বিব্রত বোধ করছেন। বললেন, 'আমার কাছে ব্যাপারটা ভারী আশ্চর্য লাগছে। এসো তো দেখা যাক ও এখন আবার ঠিকমতো কথা বলছে কি না।'

ল্যাবরেটরিতে ফিরে গিয়ে রোবুকে প্রশ্ন করতে সে আবার যথারীতি জবাব দিতে শুরু করল। হাঁটা চলাও ঠিকই করল। বুঝতে পারলাম যে ঠিক ওই একটা প্রশ্নের মুহূর্তে ওর মধ্যে কোনও একটা সাময়িক গণ্ডগোল হয়েছিল যার জন্য বেচারা জবাবটা দিতে পারেনি। এ ব্যাপারে দায়ী করতে হলে আমাকেই করতে হয়। ওর আর কী দোষ ?

সন্ধ্যার দিকে বোর্গেল্টের কাছ থেকে টেলিফোন এল। ভদ্রলোক আগামীকালের নেমন্তন্নের কথা মনে করিয়ে দিলেন। রোবুকে নিয়ে আসার কথাটাও আবার বলে বললেন, 'আমি ছাড়া আর কেউ থাকবে না, কাজেই আপনার যন্ত্র যদি গণ্ডগোল করে, বাইরের কারুর কাছে অপদস্থ হবার কোনও ভয় নেই আপনার।'

মন থেকে অসোয়াস্তি যাচ্ছিল না। কাজেই রাত্রে পাছে ঘুম না হয় সেই জন্য আমার তৈরি ঘুমের ওষুধ সম্‌নোলিনের একটা বড়ি খেয়ে নিয়েছি।

একটা কথা মনে পড়ে একটু খটকা লাগল। কাল মাঝরাত্রিতে খুট খুট আওয়াজ কেন হচ্ছিল ? পমার নিজেই কি ল্যাবরেটরিতে কাজ করছিলেন নাকি ? রোবুর ভিতরের কলকবজা তিনি কিছু বিগড়ে দেননি তো ?

পমার আর বোর্গেল্টের মধ্যে কোনও ষড়যন্ত্র চলছে না তো ?

২৭শে মে

কাল দেশে ফিরব। হাইডেলবার্গের বিভীষিকা কোনওদিন মন থেকে মুছবে বলে মনে হয় না।

তবে একটা নতুন জ্ঞান লাভ করেছি এখানে এসে। এটা বুঝেছি যে, বৈজ্ঞানিকেরা সম্মানের যোগ্য হলেও, তাঁরা সকলেই বিশ্বাসের যোগ্য নন। কিন্তু যখন ঘটনাটা ঘটল, তখন এসব কথা কিছুই মনে হয়নি। তখন কেবল মনে হয়েছিল—আমার এত কাজ বাকি, কিন্তু আমি কিছুই করে যেতে পারলাম না। কীভাবে যে প্রাণটা—

ঘটনাটা খুলেই বলি।

বোর্গেল্ট আমাদের দুজনকে নেমন্তন্ন করে গিয়েছিলেন। রোবুকে সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করা সহজ নয়, কিন্তু ভদ্রলোক যখন বলেইছেন তখন ওকে নিয়ে যাওয়াই স্থির করলাম। বিকেল চারটে নাগাদ রোবুকে বাক্সে পুরে একটা ঘোড়ারগাড়ির একদিকের সিটে তাকে কাত করে শুইয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে, তার উলটো দিকের সিটে আমরা দুজন বসে বোর্গেল্টের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলাম। মাইল তিনেকের পথ, যেতে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মতো লাগবে।

পথে যেতে যেতে রাস্তার দুধারে বসন্তকালীন চেরিফুলের শোভা দেখতে দেখতে পমারের কাছে বোর্গেল্টের পূর্বপুরুষদের কথা শুনলাম। তাঁদের মধ্যে একজন—নাম জুলিয়াস বোর্গেল্ট—ব্যারন ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মতো মরা মানুষকে জ্যান্ত করতে গিয়ে নিজেই রহস্যময়ভাবে প্রাণ হারান। এ ছাড়া দু-একজন উন্মাদ পুরুষদের কথা শোনা যায় যাঁরা নাকি বেশির ভাগ জীবনই পাগলাগারদে কাটিয়েছিলেন।

বনের ভিতর দিয়ে পাহাড়ে রাস্তা উঠে গেছে। এখানে ঠাণ্ডাটা যেন আরও বেশি, তা ছাড়া রোদও পড়ে আসছে। আমি মাফলারটা বেশ ভাল করে জড়িয়ে নিলাম।

কিছুক্ষণ চলার পর একটা মোড় ঘুরতেই সামনে একটা কারুকার্য করা বিরাট গেট দেখা

www.BDeBooks.Com

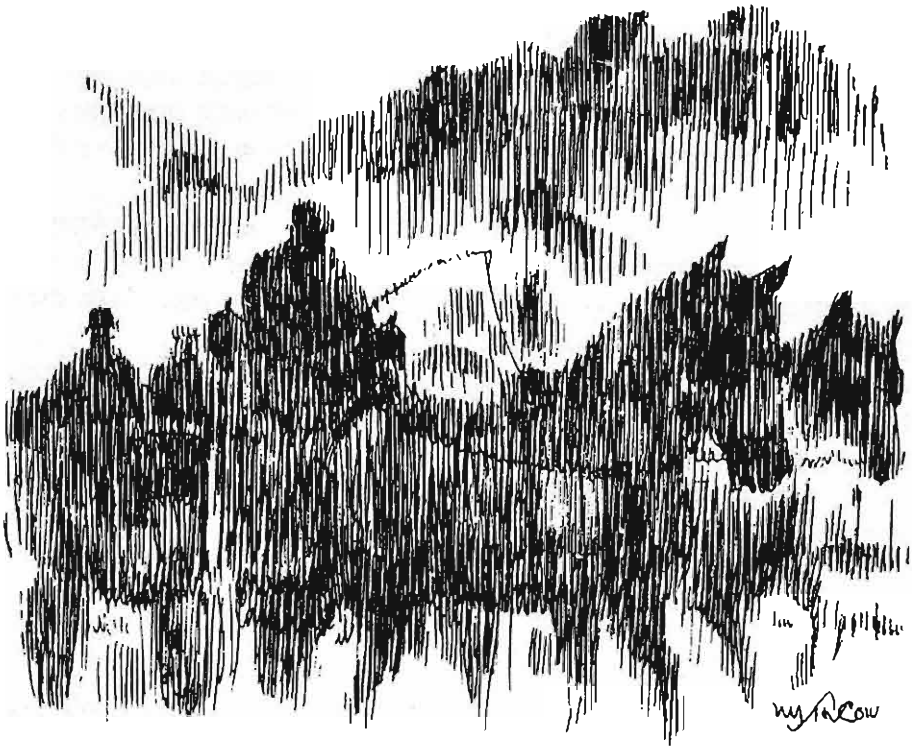

গেল। পমার বললেন, 'এসে গেছি।' গেটের উপর নকশা করে লেখা রয়েছে 'ভিলা মারিয়ান'।

একজন প্রহরী এসে গেটটা খুলে দিল। আমাদের গাড়ি তার ভিতর দিয়ে ঢুকে খট খট করতে করতে একেবারে বাড়ির দরজার সামনে উপস্থিত হল। বাড়ির চেয়ে প্রাসাদ বা কেল্লা বললেই বোধ হয় ভাল।

বোর্গেল্ট সামনেই অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের নামার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে তাঁর ঠাণ্ডা হাত দিয়ে আমাদের করমর্দন করে বললেন, 'তোমরা আসাতে আমি ভারী খুশি হয়েছি।'

তারপর দুজন ষণ্ডামার্কা চাকর বেরিয়ে এসে রোবুর বাক্সটা তুলে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল। আমরা ভিতরে বৈঠকখানায় গিয়ে বসলাম, আর তার পাশেই লাইব্রেরিতে বোর্গেল্টের আদেশ মতো রোবুকে বাক্স থেকে বার করে দাঁড় করানো হল।

সমস্ত বাড়িটা, বিশেষ করে এই বৈঠকখানা এবং তার প্রত্যেকটি জিনিস—ছবি, আয়না, ঘড়ি, ঝাড়লণ্ঠন—সব কিছুতেই যেমন প্রাচীনত্ব তেমনই আভিজাত্যের ছাপ। একটা কেমন গন্ধ রয়েছে ঘরটার মধ্যে, যেটা কিছুটা পুরনো কাঠের, আর কিছুটা যেন মনে হয় কোনও ওষুধের বা কেমিক্যালের। বোর্গেল্টেরও নিজের একটা ল্যাবরেটরি নিশ্চয়ই আছে, আর সেটা হয়তো এই বৈঠকখানারই কাছাকাছি কোথাও হবে। বাতি জ্বালানো সত্ত্বেও ঘরের আবছা অন্ধকার ভাবটা কাটল না। কাটবেই বা কী করে, এমন কোনও জিনিস ঘরে নেই যার রং

বলা যেতে পারে হালকা। সবই হয় ব্রাউন না হয় কালচে—আর সবই পুরনো। সব মিলিয়ে একটা গম্ভীর গা ছম ছম করা ভাব।

আমি মদ খাই না বলে বোর্গেল্ট আমার জন্য গেলাসে করে আপেলের রস আনিয়ে দিলেন। যে চাকরটি ট্রেতে করে পানীয় নিয়ে এল, দেখলে মনে হয় তার অন্তত নব্বুই বছর বয়স হবে। আমি হয়তো তার দিকে একটু বেশি মাত্রায় অবাক হয়ে দেখছিলাম, আর বোর্গেল্ট বোধ হয় আমার কৌতূহল মেটাবার জন্যই বললেন, 'রুডি আমার জন্মের আগে থেকেই এ বাড়িতে আছে। ওরা তিনপুরুষ ধরে আমাদের বাড়ির চাকর।'

এখানে বলে রাখি, বোর্গেল্টের মতো এমন গম্ভীর অথচ এত মোলায়েম গলার স্বর আমি আর কখনও শুনিনি।

আমরা তিনজনে হাতে গেলাস তুলে পরস্পরের স্বাস্থ্য কামনা করছি, এমন সময় বাইরে কোথা থেকে যেন টেলিফোন বেজে উঠল। তারপর বুড়ো চাকর রুডি এসে খবর দিল পমারের ফোন। পমার উঠে ফোন ধরতে চলে গেলেন।

বোর্গেল্টের হাতের গেলাসেও আপেলের রস। সেটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বোর্গেল্ট বললেন, 'প্রফেসর শঙ্কু—তুমি জান বোধ হয়, আজ ত্রিশ বছর ধরে বৈজ্ঞানিকেরা যান্ত্রিক মানুষ নিয়ে গবেষণা করছেন।'

আমি বললাম, 'জানি।'

'এ নিয়ে কিছু কাজ আমিও করেছি তা জান বোধ হয়।'

'জানি। আমি তোমার কিছু লেখাও পড়েছি।'

'আমি শেষ লেখা লিখেছি দশ বছর আগে। আমার আসল গবেষণা শুরু হয়েছে সেই লেখার পর। এই গবেষণার বিষয় একটি তথ্যও আমি কোথাও প্রকাশ করিনি।'

আমি চুপ করে রইলাম। বোর্গেল্টও চুপ করে একদৃষ্টে তাঁর কোটরাগত নীল চোখ দিয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। কোথায় যেন একটা দুম দুম করে শব্দ হচ্ছে। বাড়িরই মধ্যে, কিন্তু কাছাকাছি নয়। পমার এত দেরি করছেন কেন? উনি কার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছেন?

বোর্গেল্ট বললেন, 'পমারের ফোনটা বোধ হয় জরুরি।'

আমি চমকে উঠলাম। আমি তো কিছু বলিনি ওঁকে। উনি আমার মনের কথা বুঝলেন কী করে?

এবার বোর্গেল্ট একটা প্রশ্ন করে বসলেন যেটা আমার কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

'তোমার রোবোটা আমাকে বিক্রি করবে?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সে কী কথা! কেন বলো তো?'

বোর্গেল্ট গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমার ওটা দরকার। কারণ শুধু একটাই। আমার রোবো অঙ্ক কষতে জানে না, অথচ ওটার আমার বিশেষ প্রয়োজন।'

'তোমার রোবো কি এখানে আছে?'

বোর্গেল্ট মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

থেকে থেকে গুম গুম গুম গুম শব্দ, আর পমারের ফিরতে দেরি—এই দুটো ব্যাপারেই কেমন যেন অসোয়াস্তি লাগছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বোর্গেল্টের রোবো এই বাড়িতেই আছে জেনে, আর তাকে হয়তো দেখতে পাব এই মনে করে, একটা উত্তেজনার শিহরন অনুভব করলাম।

বোর্গেল্ট বললেন, 'আমার রোবোর মতো রোবো আজ পর্যন্ত কেউ তৈরি করতে পারেনি। আমি—গটফ্রীড বোর্গেল্ট—যা সৃষ্টি করেছি তার কোনও তুলনা নেই। কিন্তু

www.BDeBooks.Com

আমার রোবোর একটি গুণের অভাব। সে তোমারটার মতো অত সহজে অঙ্ক কষতে পারে না। অথচ তার এই অভাব পূরণ করা দরকার। তোমার রোবোটা পেলে সে কাজটা সম্ভব হবে।'

আমার ভারী বিরক্ত লাগল। এমন জিনিস কি কেউ কখনও পয়সার জন্য হাতছাড়া করে? আমার এত সাধের নিজের হাতের তৈরি প্রথম রোবো—এটা আমি হাইডেলবার্গের আধপাগলা বৈজ্ঞানিককে বিক্রি করে দেব? কীসের জন্য? আমার এমন কী টাকার দরকার পড়েছে। আর ওই অঙ্কের ব্যাপারটাতেই তো আমার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। বোর্গেল্ট যেমন রোবোই তৈরি করে থাকুন না কেন, উনি নিজে যাই বলুন, আমি জানি আমার চেয়ে আশ্চর্য কোনও যান্ত্রিক মানুষ তিনি কখনওই তৈরি করেননি।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'মাপ করো, বোর্গেল্ট। ও জিনিসটা আমি বেচতে পারব না। সত্যি বলতে কী, তুমি যখন এত বড় বৈজ্ঞানিক—তখন আরেকটু পরিশ্রম করলে আমি যে জিনিসটা করেছি সেটা তুমি করতে পারবে না কেন?'

'তার কারণ—' বোর্গেল্ট সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন—'সবাই সব জিনিস পারে না। এটাই পৃথিবীর নিয়ম। চেষ্টা করলে যে পারি তা আমিও জানি, কারণ আমার অসাধ্য কিছু নেই। কিন্তু সময় কম। আমার টাকা পয়সাও যা ছিল সবই গেছে। আমার বাড়ি দেনার দায়ে বাঁধা পড়ে আছে। সব কিছু গেছে আমার ওই একটি রোবো তৈরি করতে। কোটি কোটি মার্ক খরচ করেছি আমি ওটার পিছনে। কিন্তু ওই একটা গুণের অভাবে ওটা নিখুঁত হয়নি। ওটা আমার চাই। ওটা পেলে আমি আমার রোবো থেকেই আমার সমস্ত টাকা আবার ফিরে পাব। লোকে বলবে, হ্যাঁ—বোর্গেল্ট যা করেছে তার বেশি কিছু করা মানুষের সাধ্য নয়। আমার সিন্দুকে কিছু সোনার গেল্ড রাখা আছে—চারশো বছরের পুরনো। সে গেল্ড আমি তোমাকে দেব; তুমি রোবোটা বিক্রি করে দাও।'

সোনার লোভ দেখাচ্ছেন আমাকে! লোভ জিনিসটা যে কতকাল আগে জয় করেছি তা তো আর বোর্গেল্ট জানেন না! এবার আমিও আমার গলার স্বর যথাসম্ভব গম্ভীর করে বললাম, 'তোমার কথাবার্তার সুর আমার ভাল লাগছে না, বোর্গেল্ট। সোনা কেন—হিরের খনি দিলেও আমার রোবুকে বিক্রি করব না।'

'তা হলে আর তুমি কোনও রাস্তা রাখলে না আমার জন্য।'

এই বলে বোর্গেল্ট প্রথমেই যে কাজটা করলেন সেটা হল সোজা গিয়ে সিঁড়ির দিকের দরজাটা বন্ধ করে দেওয়া। তারপর উলটো দিকে যে দরজাটা ছিল—বোধ হয় খাবার ঘরে যাবার—সেটাও তিনি বন্ধ করে দিলেন। কাচের জানলাগুলো এমনিতেই বন্ধ। খোলা রইল শুধু লাইব্রেরির দরজা। রোবু রয়েছে ওই লাইব্রেরিঘরে, আর এই প্রথম আমার মনে হল যে, আমি হয়তো আর রোবুকে দেখতে পাব না। হয়তো সে আর কয়েকদিনের মধ্যেই অন্য মালিকের হয়ে কাজ করবে, তার হয়ে কঠিন কঠিন অঙ্কের সমাধান করবে। আর পমার? আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, পমারের সঙ্গে বোর্গেল্ট ষড় করে আমার সর্বনাশ করতে চলেছে।

দুম দুম দুম দুম—আবার সেই শব্দ শুনতে পেলাম। মনে হয় মাটির নীচ থেকে আসছে সে শব্দটা। কীসের শব্দ? বোর্গেল্টের রোবো?

আর ভাববার সময় নেই। বোর্গেল্ট আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। আবার সেই নিষ্পলক দৃষ্টি। এমন নিষ্ঠুর চাহনি আমি আর কারও চোখে দেখিনি।

এবার যখন বোর্গেল্ট কথা বললেন তখন দেখলাম তাঁর গলায় আর সে মোলায়েম ভাবটা নেই। তার বদলে একটা আশ্চর্য ইস্পাতসুলভ কাঠিন্য।

'প্রাণ সৃষ্টি করার চেয়ে প্রাণ ধ্বংস করা কত বেশি সহজ সেটা তুমি জান না শঙ্কু ?' গলার স্বর বন্ধ ঘরে গম গম করে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। 'একটি মাত্র ইলেকট্রিক শক্। কত ভোল্টের জান ? তোমার রোবু জানতে পারে।...আর সে শক্ দেওয়ার পন্থাটিও ভারী সহজ...'

আমার গায়ে সেই শক্-রোধ করা কার্বোথিনের গেঞ্জিটা পরা আছে। শকে আমার কিচ্ছু হবে না। কিন্তু গায়ের জোরে এই জার্মানের সঙ্গে পারব কী করে ?

আমি চিৎকার করে উঠলাম—'পমার ! পমার !'

বোর্গেল্ট তাঁর ডান হাতটাকে সামনে বাড়িয়ে পাঁচটা আঙুল সামনের দিকে সোজা করে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। তাঁর চোখে হিংস্র উল্লাসের দৃষ্টি।

আমি পেছোতে গিয়ে সোফায় বাধা পেলাম। পেছোনোর কোনও উপায় নেই।

বোর্গেল্টের হাতের আঙুল আমার কপাল থেকে ছ' ইঞ্চি দূরে। গিরিডির কথা—

ঠং ঠং ঠং ঠং—

একটা শব্দ শুনে আমার দৃষ্টি ডান দিকে ফিরল। বোর্গেল্টও যেন চমকে গিয়ে ঘাড় ফেরালেন। তারপর এক আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটল। ল্যাবরেটরির দরজা দিয়ে আমাদের ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত হল আমারই হাতের তৈরি যান্ত্রিক রোবু। তার চোখ এখনও ট্যারা, তার মুখে এখনও আমারই দেওয়া হাসি।

চোখের নিমেষে একটা ইস্পাতের ঝড়ের মতো এগিয়ে এসে তার হাতদুটোকে বাড়িয়ে দিয়ে সে জাপটে ধরল বোর্গেল্টকে।

আর তারপর যেটা ঘটল সেরকম বিচিত্র বীভৎস জিনিস আমি আর কখনও দেখিনি।

রোবুর হাতের চাপে বোর্গেল্টের মাথাটা যেন প্যাঁচের মতো একেবারে পিঠের দিকে ঘুরে গেল। তারপর রোবুরই টানে সেই মাথাটা শরীর থেকে একেবারে আলগা হয়ে গিয়ে মাটিতে ছিটকে পড়ল, আর শরীরের ভিতর থেকে গলার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়ল একরাশ বৈদ্যুতিক তার !

আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে প্রায় অবশ অচেতন অবস্থায় ধপ করে সোফায় বসে পড়লাম। চোখ, মন, মস্তিষ্ক সব যেন ধাঁধিয়ে গিয়েছিল।

প্রায় বেহুঁশ অবস্থায় বুঝতে পারলাম সিঁড়ির দিকের দরজায় ধাক্কা পড়ছে।

'শঙ্কু, দরজা খোলো—দরজা খোলো !'

পমারের গলা।

হঠাৎ যেন আমার শক্তি আর জ্ঞান ফিরে পেলাম। সোফা ছেড়ে উঠে দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দেখি তিনজন লোক—পমার, বোর্গেল্টের বুড়ো চাকর রুডি, আর—হ্যাঁ, কোনও সন্দেহ নেই—ইনি হলেন আসল বৈজ্ঞানিক গটফ্রীড বোর্গেল্ট।

এর পরের ঘটনা আর বেশি নেই। আমার মনের কয়েকটা প্রশ্নের মধ্যে একটা পমারের কথায় মুহূর্তেই পরিষ্কার হয়ে গেল।

'সেদিন মাঝরাত্তিরে আমি ল্যাবরেটরিতে ঢুকে তোমার রোবুর মাথার ভিতর আমারই আবিষ্কৃত একটা যন্ত্র ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। তার ফলে তোমার সঙ্গে ওর মনের একটা টেলিপ্যাথিক যোগ হয়ে গিয়েছিল। তোমার বিপদ বুঝে তাই আর ও চুপ করে থাকতে পারেনি।'

বোর্গেল্ট বললেন, 'এসব যান্ত্রিক মানুষ যন্ত্রের মতো হওয়াই ভাল। আমার রোবোকে আমি এত বেশি আমার মতো করে ফেলেছিলাম বলেই ও আমাকে সহ্য করতে পারল না।

www.BDeBooks.Com

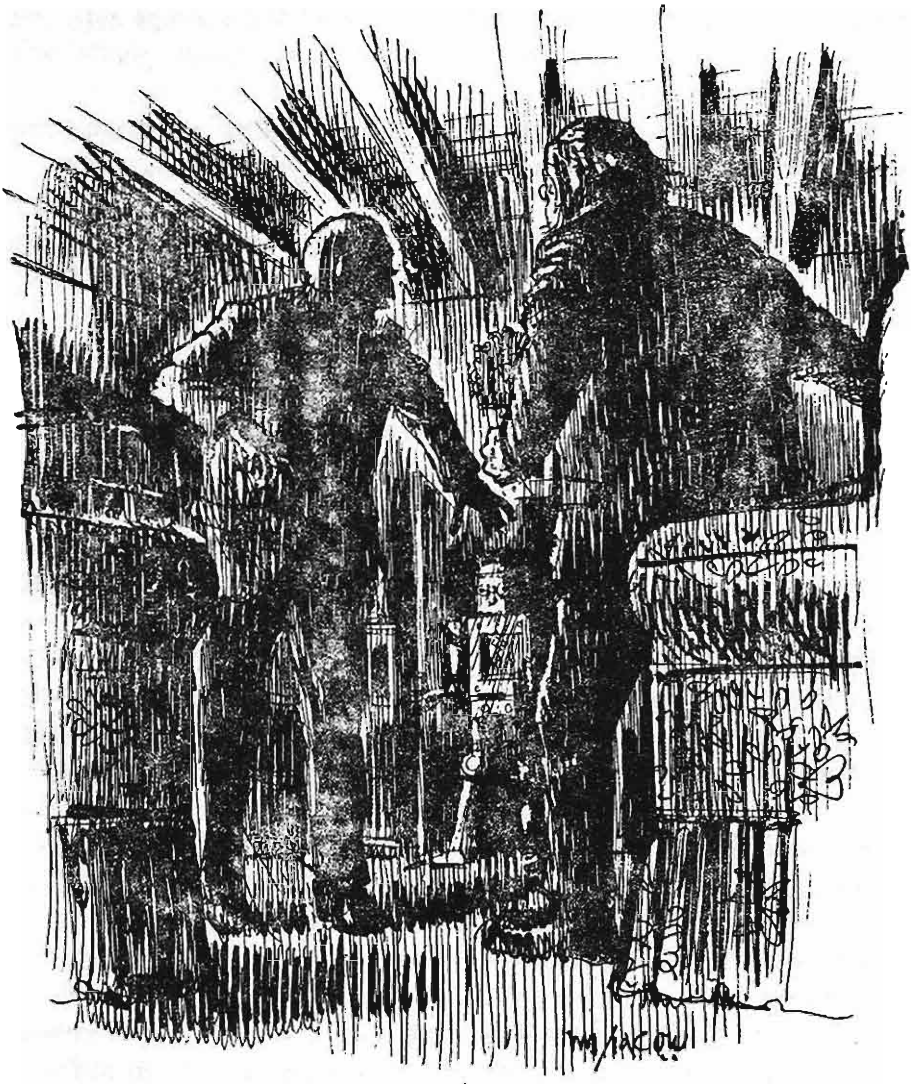

ঠিক ওরই মতো আরেকজন কেউ থাকে সেটা ও চাইল না। ভেবেছিলাম আমার মৃত্যুর পর ও আমার কাজ চালিয়ে যাবে, কিন্তু ব্রেন জিনিসটার মতিগতি কি আর মানুষ স্থির করতে পারে ? যেই ওর বাঁধন খুলে দিলাম, অমনি ও আমাকে বন্দি করে ফেলল। আমাকে মারেনি, তার কারণ ও জানত যে বিগড়ে গেলে আমি ছাড়া ওর গতি নেই।'

পমার বললেন, 'রুডি সবই জানত—কিন্তু ভয়ে কিছু করতে পারছিল না। আজকে ফোনের ধাপ্পাটা রুডিরই কারসাজি। ও চেয়েছিল আমাকে বাইরে এনে বোর্গেল্টের বন্দি হওয়ার কথাটা বলে, আর তারপর দুজনে মিলে তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে। সেই ফাঁকে যে তোমার জীবন এইভাবে বিপন্ন হবে তা আমি ভাবতে পারিনি।'

একটা জিনিস হঠাৎ বুঝতে পেরে আমার মনটা খুশিতে ভরে উঠল। বললাম, 'রোবু

সেদিন বোর্গেল্টের নাম কেন বলেনি বুঝতে পারছেন তো ? যে আসলে বোর্গেল্ট নয়, তার নাম বোর্গেল্ট ও কী করে বলবে ? আমরা বুঝিনি, কিন্তু ও ঠিক বুঝেছিল। যন্ত্রই যন্ত্রকে চেনে ভাল !'

সন্দেশ। মাঘ, ফাল্গুন ১৩৭৪

প্রোফেসর শঙ্কু ও রক্তমৎস্য রহস্য

১৩ই জানুয়ারি

গত ক'দিনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি, তাই আর ডায়রি লিখিনি। আজ একটা স্মরণীয় দিন, কারণ আজ আমার লিঙ্গুয়াগ্রাফ যন্ত্রটা তৈরি করা শেষ হয়েছে। এ যন্ত্রে যে কোনও ভাষার কথা রেকর্ড হয়ে গিয়ে তিন মিনিটের মধ্যে তার বাংলা অনুবাদ ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসে। জানোয়ারের ভাষার কোনও মানে আছে কি না সেটা জানার একটা বিশেষ আগ্রহ ছিল। আজ আমার বেড়াল নিউটনের তিন রকম ম্যাও রেকর্ড করে তার তিন রকম মানে পেলাম। একটা বলছে 'দুধ চাই', একটায় 'মাছ চাই' আর একটায় 'ইঁদুর চাই'। বেড়ালরা কি তা হলে খিদে না পেলে ডাকে না ? আরও দু রকম ম্যাও রেকর্ড না করে সেটা বোঝবার কোনও উপায় নেই।

মাছ বলতে মনে পড়ল—আজ খবরের কাগজে (মাত্র একটা বাংলা কাগজে) একটা খবর বেরিয়েছে, সেটার সত্যি মিথ্যে জানি না, কিন্তু সেটা যদি বানানোও হয়, তা হলে যে বানিয়েছে তার কল্পনাশক্তির প্রশংসা করতে হয়। খবরটা এখানে তুলে দিচ্ছি—

> 'গোপালপুর, ১০ জানুয়ারি। গোপালপুরের সমুদ্রতটে একটি আশ্চর্য ঘটনা স্থানীয় সংবাদদাতার একটি আশ্চর্য বিবরণে প্রকাশ পাইয়াছে। উক্ত বিবরণে বলা হইয়াছে যে, গতকল্য সকালে নুলিয়া শ্রেণীর কতিপয় ধীবর জাল ফেলিয়া সমুদ্র হইতে মাছ ধরিয়া সেই জাল ডাঙায় ফেলিবামাত্র উহা হইতে বিশ পঁচিশটি রক্তাভ মৎস লাফাইতে লাফাইতে পুনরায় সমুদ্রের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া জলমধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়। নুলিয়াদের কেহই নাকি এই মৎস্যের জাত নির্ণয় করিতে পারে নাই, এবং জালবদ্ধ মৎস্যের এ হেন ব্যবহার নাকি তাহাদের অভিজ্ঞতায় এই প্রথম।'

আমার প্রতিবেশী অবিনাশবাবু খবরটা পড়ে বললেন, 'এ তো সবে শুরু। এবার দেখবেন জল থেকে মাছ ড্যাঙায় ছিপ ফেলে মানুষ ধরে ধরে ফ্রাই করে খাচ্ছে। জলচর স্থলচর আর ব্যোমচর—এই তিন শ্রেণীর জীবের উপরেই মানুষ যে অত্যাচার এতদিন চালিয়ে এসেছে। একদিন না একদিন যে তার ফলভোগ করতে হবে তাতে আর আশ্চর্য কী ? আমি তো মশাই অনেকদিন থেকেই নিরামিষ ধরার কথা ভাবছি।'

এই শেষের কথাটা অবিশ্যি ডাহা মিথ্যে, কারণ, আর কিছু না হোক—অন্তত ইলিশমাছ

www.BDeBooks.Com

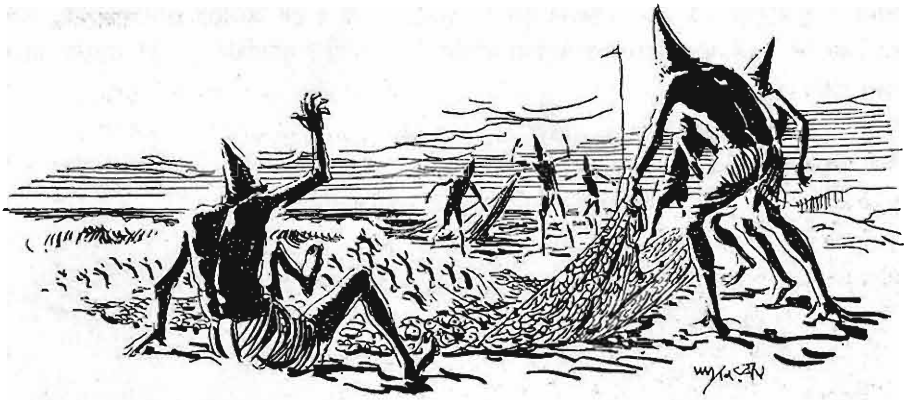

ভাজার গন্ধ পেলে যে অবিনাশবাবু আর নিউটনের মধ্যে কোনও তফাত থাকে না সেটা আমি নিজের চোখে বহুবার দেখেছি। তা অবিনাশবাবু একটুআধটু বাড়িয়ে বলেই থাকেন, তাই আমি আর কিছু বললাম না।

আজ ঠাণ্ডাটা বেশ ভাল ভাবেই পড়েছে। এটাও একটা ঘটনা। আমার ল্যাবরেটরির থার্মোমিটার সকালে দেখি ৪২ ডিগ্রি (ফাঃ)। গিরিডিতে বহুকাল এ রকম ঠাণ্ডা পড়েনি। আমার 'এয়ার কণ্ডিশনিং পিল'-টা কাজ দিচ্ছে ভাল। সার্টের বুকপকেটে একটা বড়ি রেখে দিই, আর তার ফলে গরমজামার কোনও প্রয়োজন হয় না।

১৬ই জানুয়ারি

আজকের স্টেট্‌সম্যানের প্রথম পাতায় একটা খবরের বাংলা করে দিচ্ছি।

'ওয়ালটেয়ার, ১৪ই জানুয়ারি। স্থানীয় একটা খবরে প্রকাশ যে, গতকাল সকালে একটি নরউইজীয় যুবক সমুদ্রে স্নানরত অবস্থায় একটি মাছের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করে। লার্স কর্ণস্টাট নামক ২৮ বছর বয়সের এই যুবক তারই এক মাদ্রাজি বন্ধু পরমেশ্বরের সঙ্গে জলে নেমেছিল। কোনও এক সময়ে ভারতীয় যুবক তার বন্ধুর গলায় এক আর্তনাদ শুনে তার দিকে ফিরে দেখে একটি বিঘতপ্রমাণ লাল রঙের মাছ কর্ণস্টাটের গলায় কামড়ে ধরে ঝুলে আছে। পরমেশ্বর তার বন্ধুটির কাছে পৌঁছানোর আগেই মাছটি জলে লাফিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়, আর তার পরমুহূর্তেই কর্ণস্টাটও অজ্ঞান হয়ে পড়ে। শুকনো বালির উপর কর্ণস্টাটকে এনে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ তদন্ত করছে। আপাতত ওয়ালটেয়ারের সমুদ্রে স্নান নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।'

প্রথমে গোপালপুর, তারপর ওয়ালটেয়ার। দুটো মাছ একই জাতের বলে মনে হয়। হয় দুটো খবরকেই মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে হয়, না হয় দুটোকেই বিশ্বাস করতে হয়।

আজ সারাদিন ধরে মাছ সম্বন্ধে পড়াশুনা করেছি। যতই পড়ছি ততই ঘটনাদুটির অস্বাভাবিকত্ব বুঝতে পারছি। সকালে খবরটা পড়ে বৈঠকখানায় বসে বসে ভাবছি এই সুযোগে গোপালপুরটা একবার ঘুরে এলে মন্দ হত না, এমন সময় অবিনাশবাবু লাফাতে লাফাতে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উত্তেজিত ভাবে তাঁর হাতের কাগজটা আমার নাকের সামনে

নাড়তে নাড়তে বললেন, 'পড়েছেন মশাই, পড়েছেন ? কী রকম বলেছিলাম ? অলরেডি শুরু হয়ে গিয়েছে মানুষের বিরুদ্ধে অভিযান !'

আমি বললাম, 'তা হলে বলব অভিযানটা আমার বিরুদ্ধে নয়—আপনার বিরুদ্ধে। কারণ, আমি পারতে মাছ মাংস খাই না, আর আপনার দুবেলা পাঁচটুকরো করে মাছ না হলে চলে না।'

অবিনাশবাবু ধপ করে সোফায় বসে পড়ে কাগজটা পাশে ফেলে দিয়ে বললেন, 'যা বলেছেন মশাই—মাছ ছাড়া মানুষে কী করে বাঁচে জানি না।'

আমি এ কথায় কোনও মন্তব্য না করে বললাম, 'সমুদ্র দেখেছেন ?'

অবিনাশবাবু তাঁর কম্‌ফর্টারটা আরও ভাল করে গলায় জড়িয়ে নিয়ে বললেন, 'দুর ! সমুদ্র না হাতি ! পুরীটা পর্যন্ত যাব যাব করে যাওয়া হল না। আসলে কী জানেন—সমুদ্রের মাছটা আবার আমার ঠিক রোচে না, আর ওসব জায়গায় শুনিচি খালি ওই খেতে হয়।'

আমার গোপালপুর যাবার প্ল্যান শুনে ভদ্রলোক একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'ঝুলে পড়ব নাকি আপনার সঙ্গে ? ষাটের উপর বয়স হল—সমুদ্র দেখলুম না, মরুভূমি দেখলুম না, খাণ্ডলি পাহাড় ছাড়া পাহাড় দেখলুম না—শেষটায় মরবার সময় আপশোস করতে হবে নাকি ?'

আমি নিজে গোপালপুর যাওয়া মোটামুটি স্থির করে ফেলেছি। এই অদ্ভুত মাছের সন্ধান না পেলেও, নিরিবিলিতে আমার লেখার কাজকর্মগুলো খানিকটা এগিয়ে যাবে, আর চেঞ্জও হবে ভালই।

২১শে জানুয়ারি

দুদিন হল গোপালপুর এসে পৌঁছেছি। শেষপর্যন্ত অবিনাশবাবু আমার সঙ্গ নিলেন। তবে আমি হোটেলে, আর উনি একজন স্থানীয় বাঙালির বাড়িতে পেইংগেস্ট হয়ে আছেন। পিটপিটে লোক বলেই এই ব্যবস্থা। বললেন, 'ওসব বিলিতি হোটেলে কখন যে কী বলে কীসের মাংস খাইয়ে দেয় ! তার চেয়ে পয়সা দিয়ে হিঁদুর বাড়িতে থাকা ভাল।'

আমার চাকর প্রহ্লাদকে রেখে এসেছি ; তবে নিউটনকে সঙ্গে এনেছি। ও এসেই সমুদ্রতটের কাঁকড়াদের নিয়ে ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

এখনও পর্যন্ত রক্তমাছের কোনও হদিস পাইনি। এখানে ভদ্রলোকদের মধ্যে কেউই ও মাছ দেখেনি। যে নুলিয়াদের জালে মাছগুলো ধরা পড়েছিল, তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা তো বলে এরকম ঘটনা তাদের চোদ্দোপুরুষের জীবনে কখনও ঘটেনি। জালটা টানার সময় সেটা জলে থাকতেই তারা মাছের আশ্চর্য লাল রং দেখে বুঝেছিল একটা কোনও নতুন জাতের মাছ ধরা পড়েছে। ডাঙায় তুলে জালটা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি অন্য সব মাছের ভিড়ের মধ্যে লাল মাছগুলো সব একসঙ্গে লাফিয়ে উঠে লাফাতে লাফাতে সমুদ্রের জলে গিয়ে পড়ে। লাফটা নাকি অনেকটা ব্যাঙের মতো, আর সেটা লেজের উপর ভর করে একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে। এটাও অনেক নুলিয়া লক্ষ করেছিল যে মাছের লেজটা নাকি দুভাগ হয়ে দুটো পায়ের মতো হয়ে গেছে।

অন্তত একজনও ক্যামেরাওয়ালা লোক যদি ওই ঘটনার সময় কাছাকাছি থাকত ! আমি নিজে ক্যামেরা এনেছি, আর আরও কিছু কাজে লাগার মতো যন্ত্রপাতি এনেছি। সে সব ব্যবহার করার সুযোগ আসবে কি না জানি না। আমার মেয়াদ হল সাতদিন ; যা হবার এরই মধ্যেই হতে হবে।

কাল হোটেলে এক জাপানি ভদ্রলোক এসেছেন। ডাইনিংরুমে আলাপ হল। নাম

www.BDeBooks.Com

হামাকুরা। ভাঙা ভাঙা ইংরিজি বলেন—বেশ কষ্ট করে তার মানে বুঝতে হয়। ভাগ্যিস আমার লিঙ্গুয়াগ্রাফটা সঙ্গে এনেছিলাম। এতে দুটো কাজ হয়েছে—ভদ্রলোকের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে কথা বলা সম্ভব হচ্ছে, আর উনিও আমার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা সম্পর্কে বেশ ভাল ভাবেই জেনে ফেলেছেন। উনি নিজে যে কী কাজ করেন সেটা এখনও ঠিক বুঝতে পারিনি। আমি এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে উনি ঘুরিয়ে পালটা প্রশ্ন করেন। এত লুকোবার কী আছে জানি না। কাল বিকেলবেলা উনিও আমারই মতো সমুদ্রের ধারে পায়চারি করতে বেরিয়েছিলেন। প্রায়ই দেখছিলাম উনি হাঁটা থামিয়ে একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে চেয়ে আছেন। জাপানে শুনেছি মুক্তার ব্যবসা আছে, আর জাপানি মুক্তার খ্যাতি আছে। উনি কি সেই ধান্দাতেই এলেন নাকি?

২৩শে জানুয়ারি

পরশু রাত থেকেই নানারকম ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে।

জাপানি ভদ্রলোকটি যে আমারই সমগোত্রীয়—অর্থাৎ উনিও যে বৈজ্ঞানিক—আর তাঁর গোপালপুর আসার উদ্দেশ্যটা কী—এসব খবর কী করে জানলাম সেটা আগে বলি।

গতকাল রোজকার মতো ভোরবেলা উঠে সমুদ্রের ধারে গিয়ে নুলিয়াদের জালটানা দেখছিলাম, এমন সময় জালে একটা নতুন ধরনের সামুদ্রিক জীব উঠল। বইয়ে ছবি দেখলেও এর নামটা আমার ঠিক মনে ছিল না। ওটার স্থানীয় নাম কিছু আছে কি না সেটা নুলিয়াদের জিজ্ঞেস করতে যাব, এমন সময় পিছন থেকে হামাকুরার গলা পেলাম—

'রায়ন ফিশ।' সত্যিই তো—লায়ন ফিশ!

আমি বেশ একটু অবাক হয়েই বললাম, 'তোমার এসব ব্যাপারে ইন্টারেস্ট আছে বুঝি?'

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, ওটাই হল ওঁর পেশা, সামুদ্রিক প্রাণীতত্ত্ব নিয়ে পঁচিশ বছর ধরে গবেষণা করছেন তিনি।

এটা শুনে আমি তাঁকে আবার নতুন করে তাঁর গোপালপুরে আসার কারণটা জিজ্ঞেস করলাম। হামাকুরা বললেন তিনি আসছেন সিঙ্গাপুর থেকে। ওখানে সমুদ্রের উপকূলে গবেষণার কাজ করছিলেন; হঠাৎ একদিন কাগজে গোপালপুরের 'জামুপিনি ফিশের' কথা পড়ে সেটা দেখার আশায় এখানে চলে আসেন।

'জামুপিনি' যে 'জাম্পিং', সেটা বুঝতে অসুবিধা হল না। জাপানিরা যুক্তাক্ষরকে ভেঙে কীভাবে দুটো আলাদা অক্ষরের মতো উচ্চারণ করে সেটা এ কদিনে জেনে গেছি। হসন্ত ব্যাপারটাও এদের ভাষায় নেই; আর নেই 'ল'-এর ব্যবহার। সিঙ্গাপুর আর গোপালপুর তাই হামাকুরার উচ্চারণে হল সিনুগাপুরো আর গোপারপুরো। আর আমি হয়ে গেছি পোরোফেসোরো শোনোকু।

যাই হোক, আমিও হামাকুরাকে বললাম যে, আমারও গোপালপুর আসার উদ্দেশ্য ওই একই, কিন্তু যেরকম ভাবগতিক দেখছি তাতে আসাটা খুব লাভবান হবে বলে মনে হচ্ছে না। হামাকুরা আমার কথাটা শুনে কী যেন বলতে গিয়েও বলল না। বোধ হয় ভাষার অভাবেই তার কথাটা আটকে গেল।

সন্ধ্যার দিকটা রোজই আমরা বারান্দায় বসে থাকি। বারান্দা থেকে এক ধাপ নামলেই বালি, আর বালির উপর দিয়ে একশো গজ হেঁটে গেলেই সমুদ্র। কাল বিকেলে আমি আর হামাকুরা পাশাপাশি ডেকচেয়ারে বসে আছি, আর অবিনাশবাবু একটা করাত মাছের দাঁত কিনে এনে আমাদের দেখাচ্ছেন আর বলছেন যে, এইটে বাড়িতে রাখলে আর চোর আসবে না, এমন সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল।

সন্ধ্যার আবছা আলোতে স্পষ্ট দেখতে পেলাম, সমুদ্রের মাঝখান থেকে কী যেন একটা

লম্বা জিনিস বেরিয়ে উঠল, আর তার পরমুহূর্তেই তার মাথার উপর একটা সবুজ আলো জ্বলে উঠল।

হামাকুরা জাপানি ভাষায় কী জানি বলে লাফিয়ে উঠে তার ঘরে চলে গেল। তারপর সে ঘর থেকে খট খট খুট খুট পিঁ পিঁ ইত্যাদি নানারকম শব্দ বেরোতে লাগল। সবুজ আলোটা দেখি ক্রমাগত জ্বলছে—নিভছে। তারপর একসময় সেটা আর নিভল না—জ্বলেই রইল।

এদিকে অবিনাশবাবু উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। বললেন, 'এ যেন বায়স্কোপ দেখছি মশাই। কী হচ্ছে বলুন তো ? ও জিনিসটা কী ?'

এবার হামাকুরা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তাকে দেখে মনে হল সে ভারী নিশ্চিন্ত বোধ করছে, এবং খুশিও বটে। সবুজ আলোটার দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বলল, 'মাই শিপ—তু গো দাউন—আনুদা ওয়াতা।'

বুঝলাম সেটা সাবমেরিন জাতীয় একটা কিছু—'আন্ডার ওয়াটার' অর্থাৎ সমুদ্রের তলায় চলে।

আমি বললাম, 'ওতে কে আছে ?'

হামাকুরা বলল, 'তানাকা। মাই ফুরেনোদো।'

'ইয়োর ফ্রেন্ড ?'

হামাকুরা ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলল, 'হুঁঃ, হুঁঃ।'

'উই তু—সানিতিস। গো দাউন তু সুতাদি রাইফ আনুদা ওয়াতা।'

অর্থাৎ—আমরা দুজন সায়ান্টিষ্ট—আমরা 'গো ডাউন টু স্টাডি লাইফ আন্ডার ওয়াটার।' বুঝলাম তানাকা হল হামাকুরার সহকর্মী ; ওরা দুজনে একসঙ্গে সমুদ্রগর্ভে নেমে সামুদ্রিক জীবজগৎ সম্পর্কে গবেষণা করছে।

এবার বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে জাহাজটা আমাদের দিকে এগিয়ে এসেছে, আর আলোটা ক্রমেই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

হামাকুরা বারান্দা থেকে বালিতে নেমে জলের দিকে হাঁটতে শুরু করল। আমরা দুজন তার পিছু নিলাম। জাহাজটা সম্পর্কে ভারী কৌতূহল হচ্ছিল। হামাকুরা যে এতদিন এইটেরই অপেক্ষা করছিল সেটা বুঝতে পারলাম। অবিনাশবাবু বালির উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমার কানে ফিসফিস করে বললেন, 'আপনার সঙ্গে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্র আছে আশা করি। আমার কিন্তু এদের ভাবগতিক ভাল লাগছে না মশাই। হয় এরা গুপ্তচর, নয় স্মাগলার—এ আমি বলে দিলাম।'

জলের উপর দিয়ে যেভাবে সাবমেরিনটা তীরে চলে এল তাতে বুঝলাম যে, সেটা অ্যামফিবিয়ান, অর্থাৎ জলেও চলে ডাঙাতেও চলে। পুরীর সমুদ্রতীর হলে এতক্ষণে হাজার লোক এই জাহাজ দেখতে জমে যেত, কিন্তু গোপালপুরে এই জাহাজ আসার কথা জানলাম কেবলমাত্র আমি, অবিনাশবাবু আর হামাকুরা।

আয়তনে জাহাজটা আমাদের হোটেলের একটা কামরার চেয়ে বেশি বড় নয়। আকৃতিতে মাছের সঙ্গে একটা সাদৃশ্য আছে, যদিও মুখটা চ্যাপটা। তলায় তিনটে চাকা, দুপাশে দুটো ডানা, আর লেজের দিকে একটা হাল লক্ষ করলাম। কাঁধের উপর যে ডান্ডাটা রয়েছে, সেটা জলের ভিতর পেরিস্কোপের কাজ করে। এই ডান্ডাটারই মাথার কাছে সবুজ আলোটা রয়েছে।

জল পেরিয়ে তীরে পৌঁছোতেই জাহাজটা থামল, আর তার দুপাশ থেকে দুটো কাঁটার মতো জিনিস বেরিয়ে বালির ভেতর বেশ খানিকটা ঢুকে জাহাজটাকে শক্ত করে ডাঙার সঙ্গে আটকে দিল। বুঝলাম ঢেউ এলেও সেটা আর স্থানচ্যুত হবে না।

তারপর দেখলাম জাহাজের এক পাশের একটা দরজা খুলে গিয়ে তার ভিতর থেকে একজন চশমাপরা বেঁটেখাটো গোলগাল হাসিখুশি জাপানি ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে হামাকুরার

www.BDeBooks.Com

সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে, আমাদের দিকে ফিরে বার বার নতজানু হয়ে অভিবাদন জানাতে লাগল। তারই ফাঁকে অবিশ্যি হামাকুরা তাঁর সহকর্মীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

অবিনাশবাবু এবার ফিসফিস করে বললেন, 'অতিভক্তি তো চোরের লক্ষণ বলে জানতাম। ইনি এত বার বার হেঁট হচ্ছেন কেন বলুন তো ?'

আমিও ফিসফিস করে বললাম, 'জাপানে চোর ছ্যাঁচড় সাধু সন্ন্যাসী সবাই ওভাবে হেঁট হয়। ওতে সন্দেহ করার কিছু নেই।'

সমুদ্রতীর থেকে হোটেলে ফিরে আসার পর সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে জানলাম।

তানাকাও ছিল সিঙ্গাপুরে হামাকুরার সঙ্গে। সে গোপালপুর পর্যন্ত সমস্ত পথটা সমুদ্রের তলা দিয়েই এসেছে। আর হামাকুরা এসেছে আকাশপথে আর স্থলপথে। গোপালপুরকে ঘাঁটি করে ওরা দুজন সমুদ্রের তলায় অভিযান চালাবে রক্তমৎস্যের সন্ধানে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, মিস্টার তানাকা যে এতখানি পথ জলের তলা দিয়ে এলেন—তিনি কি সেই আশ্চর্য লালমাছ একটাও দেখতে পাননি ?

তানাকা হামাকুরার চেয়েও কম ইংরেজি জানেন। আমি লিঙ্গুয়াগ্রাফের সাহায্যে বুঝতে পারলাম যে রক্তমাছের কোনও চিহ্ন তিনি দেখেননি। কিন্তু অন্য জলচর প্রাণীর হাবভাবে একটা অদ্ভুত চাঞ্চল্য লক্ষ করেছেন। রেঙ্গুনের উপকূল দিয়ে আসার সময় অনেক মাছকে মরে পড়ে থাকতে দেখেছেন। তার মধ্যে কিছু হাঙর আর কিছু শুশুকও ছিল। এসবের কারণ তানাকা কিছুই অনুমান করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর একটা ধারণা হয়েছে যে, রক্তমাছ না হলেও, অন্য কোনও জলচর প্রাণীর দৌরাত্ম্য এসব মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

তানাকাকে ক্লান্ত মনে হওয়াতে তখন আর তাকে প্রশ্ন করে বিরক্ত করলাম না।

আমার ঘরে এসে অবিনাশবাবু বললেন, 'সমুদ্রের তলায় এভাবে দিব্যি চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, এ তো ভারী অদ্ভুত ব্যাপার। কালে কালে কীই না হল !'

ভদ্রলোক এখনও জানেন না যে, সাবমেরিন বলে একটা জিনিস বহুদিন হল আবিষ্কার হয়েছে। আর লোকে সেই তখন থেকেই জলের তলায় চলাফেরা করছে। তবে, খুব বেশি গভীরে নামা আগে সম্ভব ছিল না। সেটা বোধ হয় এই জাপানি আবিষ্কৃত জাহাজে সম্ভব হচ্ছে।

অবিনাশবাবু বললেন, 'জানেন, এ জায়গাটা চট করে একঘেয়ে হয়ে যাবার একটা সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু এখন দেখছি বেশ জমে উঠেছে। বেশ একটা রোমাঞ্চ অনুভব করছি। এত কাছ থেকে দু দুটো জাপানিকে একসঙ্গে দেখব, এ কোনওদিন ভাবতে পারিনি ! তবে ওইসব মাছফাছের ব্যাপারে আমার বিশ্বাস হয় না মশাই। হুঁ—লাল মাছ ! লাল মাছটা আবার নতুন জিনিস হল নাকি ? গিরিডিতে আমাদের মিত্তিরদের বাড়িতেই তো এক গামলা ভর্তি লাল নীল কতরকম মাছ রয়েছে। আর লাফিয়ে লাফিয়ে চলাটাই আর কী এমন আশ্চর্য বলুন। কই মাছ কানে হাঁটতে কি দেখেননি আপনারা ? সেও তো একরকম লাফানোই হল।'

অবিনাশবাবু চলে যাবার পর খাওয়াদাওয়া সেরে ঘণ্টা দুয়েক একটা প্রবন্ধ লেখার কাজ খানিকটা এগিয়ে রেখে, ঘর থেকে বেরিয়ে আবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। এখানে রাত ন'টা থেকে ইলেক্‌ট্রিসিটির গোলমালে হোটেলের বাতিগুলো নিভে গিয়েছিল—তাই বেয়ারা এসে ঘরে মোমবাতি দিয়ে গিয়েছিল। বাইরে এসে দেখি সব থমথমে অন্ধকার। বারান্দার অন্যপ্রান্তে হামাকুরা আর তানাকার পাশাপাশি ঘর। সে দুটো অন্ধকার—বোধ হয় দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বহু দূরে কোথা থেকে জানি ঢোলের শব্দ আসছে। বোধ হয় নুলিয়াদের কোনও পরবটরব আছে। এ ছাড়া শব্দের মধ্যে কেবল সমুদ্রের ঢেউয়ের দীর্ঘশ্বাস।

আমি বারান্দা থেকে বালিতে নামলাম। এখনও চাঁদ ওঠেনি।

একটা মৃদু শব্দ পেয়ে পিছনে ফিরে দেখি নিউটন ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে

দাঁড়িয়েছে। তার দৃষ্টি সমুদ্রের দিকে, তার পিঠের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে, আর লেজটা ফুলে উঁচিয়ে উঠেছে।

আমারও চোখ সমুদ্রের দিকে গেল। সমুদ্রের ঢেউয়ে ফস্‌ফরাস্‌ থাকার দরুন সেটা অন্ধকারেও বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। কিন্তু এই ফস্‌ফরাসের নীলচে আলো ছাড়াও আরেকটা আলো এখন চোখে পড়ল। সেটা জ্বলন্ত কয়লার মতো লাল, আর এই লাল আভা চলে গেছে তীরের লাইন ধরে, এপাশ থেকে ওপাশ যতদূর চোখ যায়। এই আভা স্থির নয়; তার মধ্যে যেন একটা চাঞ্চল্য আছে, চলা ফেরা আছে, এগিয়ে আসা পিছিয়ে যাওয়া আছে।

নিউটন ওই লালের দিকে চেয়ে গরগর করতে আরম্ভ করল। আমি ওকে চট করে কোলে তুলে নিয়ে ঘরে রেখে, আমার সুপার-টর্চ লাগানো বাইনোকুলারটা নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আবার বারান্দায় এলাম।

টর্চটা জ্বেলে লালের দিকে তাগ করে বাইনোকুলার চোখে লাগাতেই একটা চোখ ধাঁধানো অবাক করা দৃশ্য দেখতে পেলাম। কাতারে কাতারে সোজা হয়ে দাঁড়ানো মাছের মতো দেখতে কোনও প্রাণী—তাদের প্রত্যেকটির গা থেকে লাল আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে—আর তারা যেন কৌতূহলী দৃষ্টিতে ডাঙার দিকে চেয়ে আছে।

কিন্তু এ দৃশ্য মিনিটখানেকের বেশি দেখার সৌভাগ্য হল না। আমার আলোর জন্যেই, বা অন্য কোনও কারণে কি না জানি না, সমস্ত মাছ হঠাৎ একসঙ্গে সমুদ্রের জলে ফিরে গেল—আর সেই সঙ্গে এই বিস্তীর্ণ অগ্নিরেখা অদৃশ্য হয়ে বাকি রইল শুধু ঢেউয়ের ফেনায় ফস্‌ফরাসের স্নিগ্ধ আভা।

আমি আরও কিছুক্ষণ অবাক হয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে থেকে, তারপর আস্তে আস্তে চিন্তিতভাবে আমার ঘরে ফিরে এলাম। এ কী অদ্ভুত অজানা রহস্যময় প্রাণীর আবির্ভাব হল? এতদিন এরা কোথায় ছিল? এরই একটার ছোবলে ওয়ালটেয়ারে একজন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এরা কি তা হলে মানুষের শত্রু? সমুদ্রের তলায় যে মরা মাছ তানাকা দেখেছে, তাদের মৃত্যুর জন্যেও কি এরাই দায়ী?

রাত হয়েছিল অনেক। ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ভাল ঘুম হল না। তার একটা কারণ নিউটনের ঘন ঘন গরগরানি।

* * * * *

আজ সকালে কাল রাত্রের ঘটনাটা আমার জাপানি বন্ধুদের কাছে বললাম। তানাকা শুনে বলল, 'তা হলে বোধ হয় আমাদের খুব বেশি ঘুরতে হবে না। ওরা নিশ্চয়ই কাছাকাছির মধ্যে আছে।'

আমি একটু ইতস্তত করে শেষপর্যন্ত আমার মনের কথাটা বলেই ফেললাম—

'তোমাদের ওই জাহাজে কি দুজনের বেশি লোক যেতে পারে না?'

হামাকুরা বলল, 'আমরা ছ'জন পর্যন্ত ওই জাহাজে নেমেছি। তবে বেশিদিন একটানা ঘুরতে হলে চারজনের বেশি লোক একসঙ্গে না নেওয়াই ভাল।'

আমি বললাম, 'তোমাদের আপত্তি না থাকলে আমি আর আমার বেড়াল তোমাদের সঙ্গে আসতে চাই। আমাদের খোরাকির ব্যবস্থা আমি নিজেই করব, সে বিষয় তোমাদের ভাবতে হবে না।'

হামাকুরা শুধু রাজিই হল না, খুশিও হল। তানাকা আবার রসিক লোক; সে বলল, 'তোমার ওই যন্ত্রটা সঙ্গে থাকলে হয়তো মাছের ভাষাও বুঝে ফেলা যেতে পারে।'

ঠিক হল যে পরদিন—অর্থাৎ আগামী কাল সকালে—আমরা রওনা হব। ওদের সঙ্গে খাবারদাবার আছে সাতদিনের মতো। সেই সময়টুকু আমরা একটানা সমুদ্রগর্ভে ঘুরতে পারব।

www.BDeBooks.Com

ভাগ্যিস গোপালপুরে এসেছিলাম, আর ভাগ্যিস হামাকুরাও ঠিক এখানেই এসেছিল ! সময় পেলে এ রকম একটা জাহাজ আমার পক্ষে তৈরি করে নেওয়া অসম্ভব ছিল না ; কিন্তু আপাতত এই জাপানিদের সাবমেরিনের জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারলাম না ।

আমাদের হোটেলের ম্যানেজার একজন সুইস্ মহিলা । তাকে বলে দিলাম আমাদের ঘরগুলো যেন অন্য কাউকে দিয়ে দেওয়া না হয় । এই ভদ্রমহিলাটির মতো এমন কৌতূহলমুক্ত মানুষ আমি আর দেখিনি । আমাদের এত উত্তেজনা, এত জল্পনাকল্পনা, এমনকী রক্তমৎস্যের গতরাত্রের আবির্ভাবের বর্ণনাও যেন তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করল না, বা তাঁর কৌতূহল উদ্রেক করল না । তিনি কেবল বললেন—'যে কদিন থেকেছ তার ভাড়াটা চুকিয়ে দিলে, যে কদিন থাকবে না তার ভাড়াটা আমি ধরব না । তোমাদের যদি দুর্ভাগ্যক্রমে সলিল সমাধি হয়, তাই ভাড়াটা আমি আগে থেকে দিয়ে দিতে বলছি।' আশ্চর্য হিসেবি মহিলা !'

দুপুরের দিকে অবিনাশবাবু এসে আমাকে গোছগাছ করতে দেখে বললেন, 'কী মশাই—ফেরার তাল করছেন নাকি ? সবে তো খেলা জমেছে !'

আমি অবিনাশবাবু সম্পর্কে একটু কিন্তু কিন্তু বোধ করছিলাম ; তবে এটাও বুঝেছিলাম যে, এখন অবিনাশবাবুর কথা ভাবলে চলবে না । তিনি এর মধ্যেই দু-একজন স্থানীয় বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছেন ; কাজেই তাঁকে যে একেবারে অকূলপাথারে ফেলে দিয়ে যাচ্ছি তাও নয় ।

আমার গোছগাছের কারণ বলাতে অবিনাশবাবু এক মুহূর্তের জন্য থ' মেরে গিয়ে তারপর একেবারে হাত পা ছুড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তলে তলে আপনি এই মতলব ফাঁদছিলেন ? আপনি তো আচ্ছা সেলফিশ লোক মশাই ! শুধু আপনারই হবে কেন এই প্রিভিলেজ ? আপনি বৈজ্ঞানিক হতে পারেন—কিন্তু আপনি মাছ সম্বন্ধে কী জানেন ? আমি তো তবু মাছ-খোর—ভালবেসে মাছ খাই । আর আপনি তো প্র্যাক্‌টিক্যালি মাছ খানই না !'

আমি কোনওমতে তাঁকে থামিয়েটামিয়ে বললাম, 'আপনাকে যদি সঙ্গে নিই তা হলে খুশি হবেন ?'

'আলবৎ হব ! এমন সুযোগ ছাড়ে কে ? আমার বউ নেই ছেলে নেই পুলে নেই—আমার বন্ধনটা কীসের ? এতে তবু একটা কিছু করা হবে—লোককে অন্তত বলতে পারব যে, 'ফরেনে' গেছি—তা সে মাছের দেশ না মানুষের দেশ সেটা বলার কী দরকার ?'

হামাকুরাকে অবিনাশবাবুর কথা বলাতে সে একগাল হেসে বলল, 'উই জাপান তু—ইউ বেনেগারি তু—পারুফেকোতু !'

অর্থাৎ—আমরা জাপানি দুজন, তোমরা বাঙালি দুজন—পার্ফেক্ট ।

কাল সকালে আমাদের সমুদ্রগর্ভে অভিযান শুরু । কী আছে কপালে ঈশ্বর জানেন । তবে এটা জানি যে এ সুযোগ ছাড়া ভুল হত । আর যাই হোক না কেন—একটা নতুন জগৎ যে দেখা হবে সে বিষয় তো কোনও সন্দেহ নেই ।

২৪শে জানুয়ারি

ঠিক বারো ঘণ্টা আগে আমরা সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করেছি ।

এখানে ডায়রি লেখার সুযোগ সুবিধে হবে কি না জানতাম না । এসে দেখছি দিব্যি আরামে আছি । ব্যবস্থা এত চমৎকার, আর অল্প জায়গার মধ্যে ক্যাবিনটা এত গুছিয়ে প্ল্যান করা হয়েছে যে, কোনও সময়েই ঠাসাঠাসি ভাবটা আসে না ।

নিশ্বাসের কোনও কষ্ট নেই । খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাটা জাপানি, আর সেটা আমার ধাতে

আসবে না বলে আমি আমার 'বটিকা ইণ্ডিকা'র একটা বড়ি দিয়ে খাওয়া সেরেছি। আমার আবিষ্কৃত এই বড়ির একটাতেই পুরো দিনের খাওয়া হয়ে যায়। জাপানিরা কাঁচা মাছ খেতে ভালবাসে, এরাও তাই খাচ্ছে বলে নিউটনের ভারী সুবিধে হয়েছে। অবিনাশবাবু আজ শাকসবজি খেলেন, আর এক পেয়ালা জাপানি চা খেলেন। বুঝলাম এতে ওঁর মন আর পেট কোনওটাই ভরল না। কাল বলেছেন আমার বড়ি একটা খেয়ে নেবেন, যদিও আমি জানি এ বড়িতে ওঁর একেবারেই বিশ্বাস নেই।

আমার নিজের কথা বলতে পারি যে, এখানে এসে অবধি খাওয়ার কথাটা প্রায় মনেই আসছে না—কারণ, সমস্ত মন পড়ে রয়েছে ক্যাবিনের ওই তিনকোনা জানালাটার দিকে।

জাহাজ থেকে একটা তীব্র আলো জানালার বাইরে প্রায় পঁচিশ গজ দূর পর্যন্ত আলো করে দিয়েছে, আর সেই আলোতে এক বিচিত্র, ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল জগৎ আমাকে একেবারে স্তব্ধ করে রেখেছে। এইমাত্র দশ মিনিট হল আমাদের জাহাজ থেমেছে। হামাকুরা আর তানাকা ডুবুরির পোশাক পরে জাহাজ থেকে বেরিয়ে কিছু সামুদ্রিক উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করতে গেছে। এই যাবার সুযোগটা নিয়ে আমি ডায়রি লিখে ফেলছি। অবিনাশবাবু বললেন, 'আপনাকে ওই পোশাক পরিয়ে দিলে আপনি বাইরে বেরোতে পারেন?' আমি বললাম, 'কেন পারব না? ওতে তো বাহাদুরির কিছু নেই। জলের তলায় যাতে সহজে চলাফেরা করা যায় তার জন্যেই তো ওই পোশাক তৈরি। আপনাকে পরিয়ে দিলে আপনিও পারবেন।'

অবিনাশবাবু দুহাত দিয়ে তাঁর নিজের দুকান ম'লে বললেন, 'রক্ষে করুন মশাই—বাড়াবাড়িরও একটা সীমা আছে। আমি এর মধ্যেই বেশ আছি। সাধ করে হাবুডুবু খাওয়ার মতো ভীমরতি আমার ধরেনি।'

সকাল থেকে নিয়ে আমরা প্রায় পঁচিশ মাইল পথ ঘুরেছি সমুদ্রের তলায়। উপকূল থেকে খুব বেশি দূরে সরে ভিতরের দিকে যাইনি, কারণ মাছগুলো যখন জালে ধরা পড়েছিল, আর পরশু রাত্রেও যখন তাদের ডাঙায় উঠতে দেখেছি, তখন তারা যে কাছাকাছির মধ্যেই আছে এটা আন্দাজ করা যেতে পারে।

খুব বেশি গভীরেও যাইনি আমরা, কারণ তিন সাড়ে তিন হাজার ফুটের নীচে সূর্যের আলো পৌঁছায় না বলে মাছও সেখানে প্রায় থাকে না বললেই চলে। অন্তত রঙিন মাছ তো নয়ই, কারণ সূর্যের আলোই মাছের রঙের কারণ।

এই বারো ঘণ্টার মধ্যেই যে কত বিচিত্র ধরনের মাছ ও সামুদ্রিক উদ্ভিদ দেখেছি তার আর হিসেব নেই। দশ ফুট নীচে নামার পর থেকেই জেলি ফিশ জাতীয় মাছ দেখতে পেয়েছি। ওগুলোও যে মাছ সেকথা অবিনাশবাবু বিশ্বাসই করবেন না। খালি বলেন, 'ল্যাজ নেই, আঁশ নেই, মাথা নেই, কানকো নেই—মাছ বললেই হল?'

প্ল্যাঙ্কটন জাতীয় উদ্ভিদ দেখে অবিনাশবাবু বললেন, 'ওগুলোও কি মাছ বলে চালাতে চান নাকি?'

আমি ওঁকে বুঝিয়ে দিলাম যে ওগুলো সামুদ্রিক গাছপালা। অনেক মাছ আছে যারা এইসব গাছপালা খেয়েই জীবনধারণ করে।

অবিনাশবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, 'মাছের মধ্যেও তা হলে ভেজিটেরিয়ান আছে! ভারী আশ্চর্য তো!'

তানাকা উদ্ভিদ সংগ্রহ করে ফিরে এসেছে, আর আমাদের জাহাজ আবার চলতে শুরু করেছে। কাতারে কাতারে মাছের দল আমাদের জানালার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। একটা বিরাট চ্যাপটা মাছ এগিয়ে এল, আর ভারী কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে আমাদের কেবিনের ভিতরটা দেখতে লাগল। জাহাজ চলেছে আর মাছও সঙ্গে সঙ্গে চলেছে—তার দৃষ্টি আমাদের

www.BDeBooks.Com

দিকে। নিউটন জানালার সামনের টেবিলের উপর উঠে কাচের উপর থাবা দিয়ে ঠিক মাছটার মুখের উপর ঘষতে লাগল। প্রায় পাঁচ মিনিট এইভাবে চলার পর মাছটা হঠাৎ বেঁকে পাশ কাটিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তানাকা দিনেরবেলা মাঝে মাঝে সার্চলাইট নিভিয়ে দিচ্ছেন স্বাভাবিক আলো কতখানি আছে দেখবার জন্য। বিকেলের পর থেকে আলো আর নেভানো হয়নি।

ঘণ্টাখানেক আগেই হামাকুরা বলেছে, 'যদি হাজার ফুট গভীরতার মধ্যে রক্তমাছ দেখা না যায়, তা হলে আমরা উপকূল থেকে আরও দূরে গিয়ে আরও গভীরে নামব। এমনও হতে পারে যে, এ মাছ হয়তো একেবারে অন্ধকার সামুদ্রিক জগতের মাছ।'

আমি তাতে বললাম, 'কিন্তু এরা যে সূর্যের আলোতে বেরোতে পারে, সেটার তো প্রমাণ পাওয়া গেছে।'

হামাকুরা গম্ভীরভাবে বলল, 'জানি। আর সেখানেই তো এর জাত বুঝতে এত অসুবিধে হচ্ছে। সহজে এর সন্ধান পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।'

তানাকা তার ক্যামেরা দিয়ে ক্রমাগত সামুদ্রিক জীবের ছবি তুলে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে দুটো হাঙর একেবারে জানালার কাছে এসে পড়েছিল। তাদের হাঁয়ের মধ্যে দিয়ে ধারালো দাঁতের পাটি দেখে সত্যিই ভয় করে।

অবিনাশবাবুকে বললাম, 'ওই যে হাঙরের পিঠে তিনকোনা ডানার মতো জিনিসটা দেখছেন, ওটিও মানুষের খাদ্য। ইচ্ছে করলে চিনে রেস্টোরেন্টে গিয়ে Shark's Fin Soup খেয়ে দেখতে পারেন আপনি।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'সে তো বুঝলুম। সেরকম তো ষাঁড়ের ল্যাজের Soupও হয় বলে শুনেছি। কিন্তু ভেবে দেখুন—যে প্রথম এইসব জিনিস খেয়ে তাকে খাদ্য বলে সার্টিফিকেট দিল—তার কত বাহাদুরি! কচ্ছপ জিনিসটাকে দেখলে কি আর তাকে খাওয়া যায় বলে মনে হয়?'—আমাদের জানালার বাইরে দিয়ে তখন একজোড়া কচ্ছপ সাঁতার কেটে চলেছে—'ওই দেখুন না—পা দেখুন, মাথা দেখুন, খোলস দেখুন—যাকে বলে কিম্ভূত। অথচ কী সুস্বাদু!'

এখন বাজে রাত সাড়ে আটটা। অবিনাশবাবু এরমধ্যেই বার দুই হাই তুলেছেন। তানাকা একটা থার্মোমিটারে জলের তাপ দেখছে। হামাকুরা খাতা খুলে কী যেন লিখছে। ক্যাবিনের রেডিওতে ক্ষীণ স্বরে একটা মাদ্রাজি গান ভেসে আসছে। রক্তমৎস্যের কোনও সন্ধান আজকের মধ্যে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

২৫শে জানুয়ারি, সকাল ৮টা

কাল রাত্রের একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা এইবেলা লিখে রাখি।

হামাকুরা আর তানাকা পালা করে জাহাজটা চালায়, কারণ একজনের পক্ষে ব্যাপারটা ক্লান্তিকর হয়ে পড়ে। আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন ঘড়িতে বেজেছে রাত সাড়ে এগারোটা। সাতশো ফুট গভীরে সমুদ্রের জমির চার হাত উপর দিয়ে চলেছে আমাদের জাহাজ। হামাকুরার হাতে কন্ট্রোল, তানাকা চোখ বুজে তার বাঙ্কে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। অবিনাশবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন, আর তাঁর নাক এত জোরে ডাকছে যে এক একবার মনে হচ্ছে তাঁকে সঙ্গে না নিলেই বোধ হয় ভাল ছিল। আমার দৃষ্টি জানালার বাইরে। একটা 'ইলেক্‌ট্রিক ঈল' মাছ কিছুক্ষণ হল আমাদের সঙ্গ নিয়েছে। এমন সময় সার্চলাইটের আলোতে দেখলাম সমুদ্রের মাটিতে কী যেন একটা জিনিস চকচক করে উঠল।

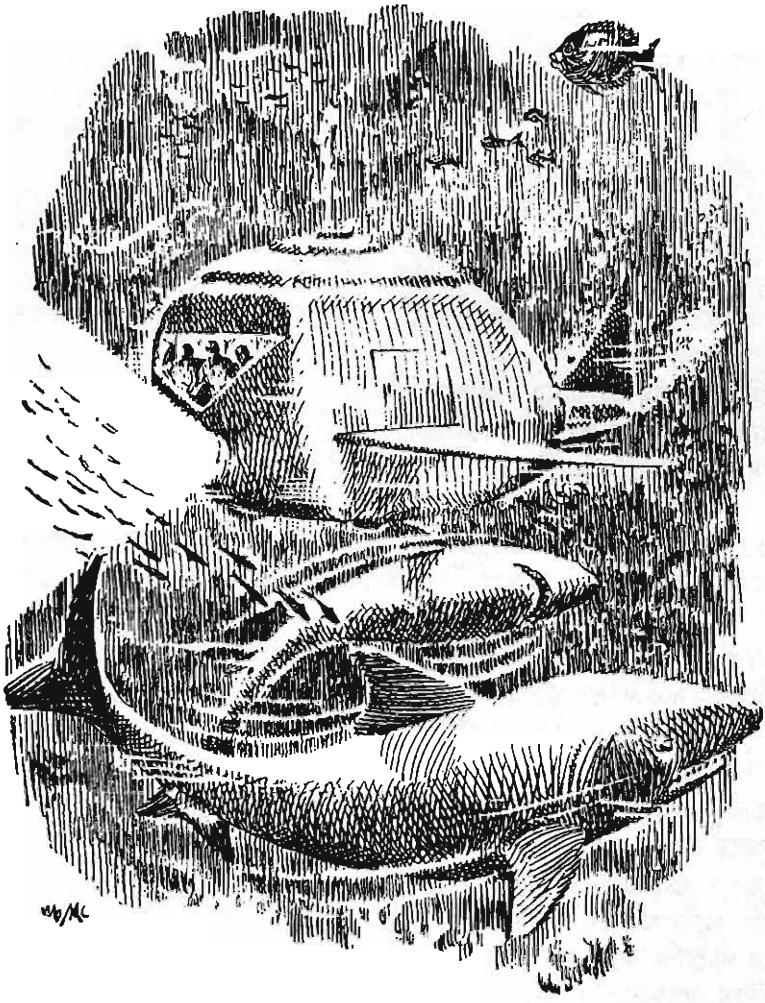

হামাকুরার দিকে চেয়ে দেখি সেও চকচকে জিনিসটার দিকে দেখছে। তারপর দেখলাম সে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে জাহাজটাকে সেই দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এবার জানালার দিকে এগিয়ে যেতেই বুঝলাম সেটা একটা হাতচারেক লম্বা কারুকার্য করা পিতলের কামান। সেটা যে এককালে কোনও জাহাজে ছিল, আর সেই জাহাজের সঙ্গে যে সেটা জলের তলায় ডুবেছে, সেটাও আন্দাজ করতে অসুবিধে হল না।

তা হলে কি সেই জাহাজের ভগ্নাবশেষও কাছাকাছির মধ্যেই কোথাও রয়েছে?

মনে মনে বেশ একটা চাপা উত্তেজনা অনুভব করলাম। কামানের চেহারা দেখে সেটা যে অন্তত তিন-চারশো বছরের পুরনো সেটা বোঝা যায়। মোগল জাহাজ, না ওলন্দাজ জাহাজ, না বৃটিশ জাহাজ?

হামাকুরা আবার জাহাজের স্টিয়ারিং ঘোরাল। সার্চলাইটের আলোও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গেল, আর ঘুরতেই, কোনও এক অতিকায় সামুদ্রিক জীবের কঙ্কালের মতো চোখে পড়ল

www.BDeBooks.Com

জাহাজটা। এখান দিয়ে একটা মাস্তুল, ওখানে হালের অংশ, পাঁজরের মতো কিছু খেয়ে যাওয়া ইস্পাতের কাঠামো, এখানে ওখানে মাটিতে ছড়ানো নানান আকারের ধাতুর জিনিসপত্র। প্রাচীন জাহাজডুবির প্রমাণ সর্বত্র ছড়ানো। দুর্ঘটনার কারণ ঝড় না যুদ্ধ তা জানি না, বা জানার কোনও উপায় নেই।

এরমধ্যে তানাকাও বিছানা ছেড়ে উঠে এসে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে বাইরের দৃশ্য দেখছে।

আমি অবিনাশবাবুকে ঘুম থেকে তুললাম। দৃশ্য দেখে তাঁর চোখ একেবারে ছানাবড়া হয়ে গেল।

হামাকুরা জাহাজটাকে নোঙর ফেলে মাটিতে দাঁড় করাল। অবিনাশবাবু বললেন, 'এ যে আরব্যোপন্যাসের কোনও দৃশ্য দেখছি মশাই! একবার নিজেকে মনে হচ্ছে সিন্ধবাদ, একবার মনে হচ্ছে আলিবাবা!'

আলিবাবার নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমার একটা কথা মনে হল। জাহাজের সঙ্গে কি কিছু ধনরত্নও সমুদ্রের তলায় তলিয়ে যায়নি? বাণিজ্যপোত হলে স্বর্ণমুদ্রা তাতে থাকবেই, আর সে তো জাহাজের সঙ্গে সঙ্গেই ডুববে, আর সে জিনিস তো নোনা ধরে নষ্ট হয়ে যাবার নয়।

জাপানিদের হাবভাবেও একটা গভীর উত্তেজনা লক্ষ করলাম। দুজনে কিছুক্ষণ কী জানি কথাবার্তা বলল। তারপর আমার দিকে ফিরে হামাকুরা বলল, 'উই গো আউত। ইউ কাম?'

কথা শুনে বুঝলাম, আমি যা সন্দেহ করছি, ওরাও তাই করছে। সত্যিই কোনও ধনরত্ন আছে কি না সেটা একবার ঘুরে দেখতে চায় ওরা।

অবিনাশবাবু এতক্ষণ আমাদের মধ্যে কী কথাবার্তা হচ্ছিল সেটা ঠিক বুঝতে পারেননি। হঠাৎ সেটা আঁচ করে চোখের পলকে তিনি একেবারে নতুন মানুষ হয়ে গেলেন।

'রত্ন? মোহর? সোনা? রুপো? এসব কী বলছেন মশাই? এও কি সম্ভব? অ্যাদ্দিন পড়ে আছে জলের তলায়—নষ্ট হয়নি? ইচ্ছে করলে আমরা নিতে পারি? নিলে আমাদের হয়ে যাবে? উঃ! বলেন কী মশাই, বলেন কী!'

আমি অবিনাশবাবুকে খানিকটা শান্ত করে বললাম, 'অত উত্তেজিত হবেন না। এ ব্যাপারে গ্যারেন্টি কিছু নেই! এটা আমাদের অনুমান মাত্র। আছে কি না আছে সেটা এঁরা দুজন গিয়ে দেখবেন।'

'শুধু এঁরা দুজন কেন? আমরা যাব না?'

আমি তো অবাক। কী বলছেন অবিনাশবাবু!

আমি বললাম, 'আপনি যেতে পারবেন? ওই জলের মধ্যে? হাঙরের মধ্যে? ডুবুরির পোশাক পরে?'

'আলবৎ পারব!' অবিনাশবাবু চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলেন। ধনরত্নের লোভ তাঁর মতো সাধারণ, ভিতু মানুষের মনে এতটা সাহস আনতে পারে এ আমার ধারণা ছিল না।

কী আর করি? নিউটনকে ফেলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া, সত্যি বলতে কী, ধনরত্ন আছে কি না সঠিক জানা তো নেই, আর ও বিষয় আমার তেমন লোভও নেই। হামাকুরাকে বললাম, 'আমার বন্ধু যাবে তোমাদের সঙ্গে। আমি ক্যাবিনেই থাকব।'

দশ মিনিটের মধ্যে ডুবুরির পোশাক পরে তিনজন ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই জানালা দিয়ে তাদের ভগ্নস্তূপের দিকে অগ্রসর হতে দেখলাম। তিনজনেরই আপাদমস্তক ঢাকা একই পোশাক হওয়াতে তাদের আলাদা করে চেনা মুশকিল,

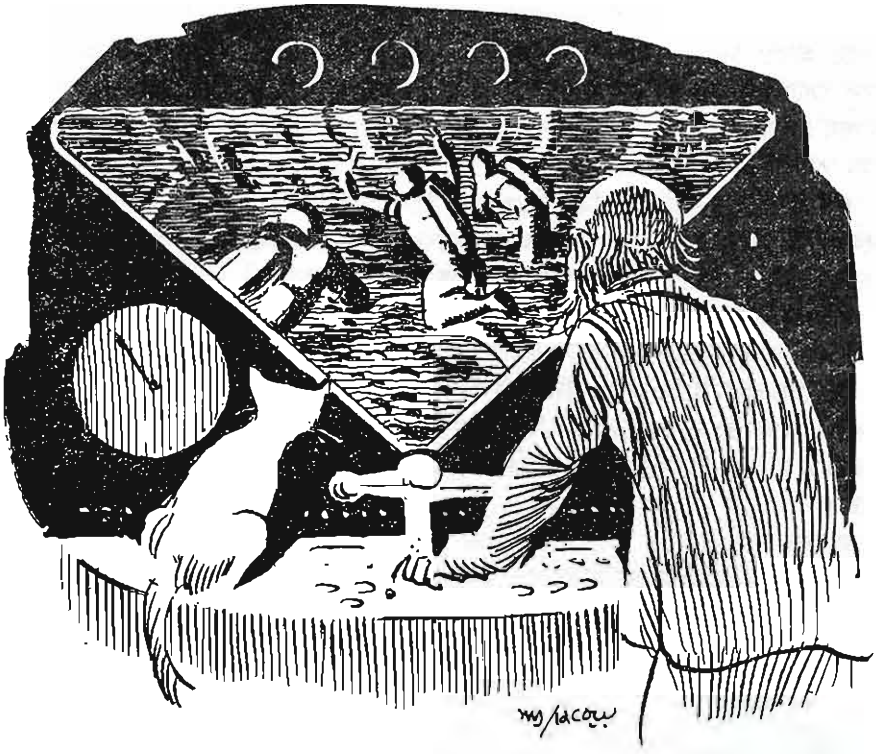

তবে তাদের মধ্যে যিনি হাত পা একটু বেশি ছুড়ছেন, তিনিই যে অবিনাশবাবু সেটা সহজেই আন্দাজ করা যায়।

আরও মিনিট পাঁচেক পরে দেখলাম তিনজনেই মাটিতে নেমে ভগ্নস্তূপের মধ্যে মাটির দিকে দৃষ্টি রেখে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবিনাশবাবুকে যেন একবার নিচু হয়ে মাটিতে হাতড়াতেও দেখলাম।

তারপর যে ব্যাপারটা হল তার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। হঠাৎ অনুভব করলাম যে জলের মধ্যে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ জাতীয় কিছু হওয়ার দরুন আমাদের জাহাজটা সাংঘাতিকভাবে দুলে উঠল, আর সেই সঙ্গে তিন ডুবুরির দেহ ছিটকে গিয়ে জলের মধ্যে ওলটপালট খেতে খেতে আমাদের জাহাজের দিকে চলে এল। চারিদিকে মাছের ঝাঁকের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য আর দিশেহারা ভাব দেখেও বুঝলাম যে অত্যন্ত অস্বাভাবিক একটা কিছু ঘটেছে।

দুই জাপানি, ও বিশেষ করে অবিনাশবাবুর জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বোধ করছিলাম। কিন্তু তারপর যখন দেখলাম তিনজনেই আবার মোটামুটি সামলে নিয়ে জাহাজের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম।

হামাকুরা আর তানাকা অবিনাশবাবুকে ধরাধরি করে ক্যাবিনে ঢুকল। তারপর তারা পোশাক ছাড়লে পর অবিনাশবাবুর ফ্যাকাশে মুখ দেখেই তাঁর শরীর ও মনের অবস্থাটা বেশ বুঝতে পারলাম। ভদ্রলোক বিছানায় বসে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'কুষ্ঠীতে ছিল বটে—যে একষট্টিতে একটা ফাঁড়া আছে, কিন্তু সেটা যে এমন ফাঁড়া তা জানতুম না।'

www.BDeBooks.Com

আমার কাছে আমারই তৈরি স্নায়ুকে সতেজ করার একটা ওষুধ ছিল। সেটা খেয়ে পাঁচমিনিটের মধ্যেই অবিনাশবাবু অনেকটা সুস্থ বোধ করলেন, আর তারপর জাহাজও আবার চলতে আরম্ভ করল। বলা বাহুল্য, এই অল্প সময়ের মধ্যে ধনরত্নের সন্ধান কেউই পায়নি। তবে সেটা নিয়ে এখন আর কারুর বিশেষ আক্ষেপ বা চিন্তা নেই। সকলেই ভাবছে ওই আশ্চর্য বিস্ফোরণের কথা। আমি বললাম, 'কোনও তিমি জাতীয় মাছ কাছাকাছি চললে কি এমন আলোড়ন সম্ভব ?'

তানাকা হেসে বলল, 'তিমি যদি পাগলা হয়ে গিয়ে জলের মধ্যে ডিগবাজিও খায়, তা হলেও তার ঠিক আশেপাশের জলে ছাড়া কোথাও এমন আলোড়ন হতে পারে না। এটা যে কোনও একটা বিস্ফোরণ থেকেই হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'ভূমিকম্পের মতো জলকম্পও হয় নাকি মশাই ? আমার তো যেন সেইরকমই মনে হল।'

আসলে, কাছাকাছির মধ্যে হলে কারণটা হয়তো বোঝা যেত। বিস্ফোরণটা হয়েছে বেশ দূরেই। অথচ তা সত্ত্বেও কী সাংঘাতিক দাপট ! কাছে হলে, অত্যন্ত মজবুত ভাবে তৈরি বলে জাহাজটা যদি বা রক্ষে পেত, মানুষ তিনজনের যে কী দশা হতে পারত সেটা ভাবতেও ভয় করে।

জাহাজ ছাড়বার আধ ঘণ্টার মধ্যেই সমুদ্রের জলে বিস্ফোরণের নানা রকম চিহ্ন দেখতে শুরু করলাম। অসংখ্য ছোট মরা মাছ ছাড়াও সাতটা মরা হাঙর আমাদের আলোয় দেখতে পেলাম। একটা অক্টোপাসকে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে চোখের সামনে মরতে দেখলাম। এছাড়া জলের উপর দিক থেকে দেখি অজস্র জেলি ফিশ, স্টার ফিশ, ঈল ও অন্যান্য মাছের মৃতদেহ ধীরে ধীরে নীচে নেমে আসছে। আমাদের আলোর গণ্ডির মধ্যে পৌঁছোলেই তাদের দেখা যাচ্ছে।

আমি হামাকুরাকে বললাম, 'বোধ হয় জলের তাপ বেড়েছে, অথবা জলের সঙ্গে এমন একটা কিছু মিশেছে যা মাছ আর উদ্ভিদের পক্ষে মারাত্মক।'

তানাকা তার যন্ত্র দিয়ে জলের তাপ মেপে বলল, '৪৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড—অর্থাৎ যাতে এসব প্রাণী বাঁচে তার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ।'

কী আশ্চর্য ! এমন হল কী করে ? একমাত্র কারণ বোধ হয় এই যে জলের তলায় একটা আগ্নেয়গিরি ছিল যেটার মুখ এতদিন বন্ধ ছিল। আজ সেটা ইরাপ্ট করেছে—আর তার ফলেই এত কাণ্ড। এছাড়া তো আর কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।

২৬শে জানুয়ারি, রাত ১২টা

আমাদের ডুবুরি জাহাজের রেডিও সন্ধ্যা থেকে চালানো রয়েছে। দিল্লি, টোকিও, লণ্ডন আর মস্কোর খবর ধরা হয়েছে। ফিলিপিনের ম্যানিলা উপকূলে, আফ্রিকার কেপ টাউনের সমুদ্রতীরে, ভারতবর্ষের কোচিন সমুদ্রতটে, রিও ডি জ্যানিরোর সমুদ্রতটে, আর ক্যালিফর্নিয়ার বিখ্যাত ম্যালিবু বিচে রক্তমৎস্য দেখা গেছে। সবসুদ্ধ একশো ত্রিশ জন লোক এই রাক্ষুসে মাছের ছোবলে মারা গেছে বলে প্রকাশ। সারা বিশ্বে গভীর চাঞ্চল্য ও বৈজ্ঞানিকদের মনে চরম বিস্ময় দেখা দিয়েছে। বহু সমুদ্রতত্ত্ববিদ্ এই নিয়ে গবেষণা শুরু করে দিয়েছে। কোথায় কখন রক্তখাকী রক্তমৎস্যের আবির্ভাব হবে, সেই ভয়ে সমুদ্রে স্নান করা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এমনকী জলপথে ভ্রমণ অনেক কমে গেছে—যদিও নৌকা বা জাহাজের গা বেয়ে মাছ উঠে মানুষকে আক্রমণ করেছে এমন কোনও খবর এখনও পাওয়া যায়নি।

কোত্থেকে কী ভাবে এই অদ্ভুত প্রাণীর উদ্ভব হল তা এখনও কেউ বলতে পারেনি। পৃথিবীতে এভাবে অকস্মাৎ নতুন কোনও প্রাণীর আবির্ভাব গত কয়েক হাজার বছরের মধ্যে হয়েছে বলে জানা নেই।

আমরা এরমধ্যে বিকেল পাঁচটা নাগাত একবার জলের উপরে উঠেছিলাম। গোপালপুর থেকে প্রায় ১০০ মাইল দক্ষিণে চলে এসেছি আমরা। সমুদ্রতট থেকে জলের দিকে বিশ গজ দূরে আমাদের ডুবুরি জাহাজ রাখা হয়েছিল! ডাঙায় কোনও বসতির চিহ্ন চোখে পড়ল না। সামনে বালি, পিছনে ঝাউবন, আর আরও পিছনে পাহাড় ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

নিউটন সমেত আমরা চারজনই ডাঙায় গিয়ে কিছুক্ষণ পায়চারি করলাম। বিস্ফোরণ নিয়ে আমরা সকলেই ভাবছি, এমনকী অবিনাশবাবুও তাঁর মতামত দিতে কসুর করছেন না। একবার বললেন, 'বাইরে থেকে তাগ করে কেউ জলে বোমাটোমা ফেলেনি তো?'

অবিনাশবাবু খুব যে বোকার মতো বলেছেন তা নয়। কিন্তু জলের মধ্যে বোমা কেন? কার শত্রু সমুদ্রের জলে বাস করছে? জলের মাছ আর উদ্ভিদের উপর কার এত আক্রোশ হবে!

আধ ঘণ্টা খোলা হাওয়ায় পায়চারি করে আমরা জাহাজে ফিরে এলাম।

সূর্যের আলো জলের নীচে যে পর্যন্ত পৌঁছোয়, তারমধ্যে রক্তমাছের সন্ধান পাওয়া যায়নি বলে এবার আমরা ঠিক করেছি উপকূল থেকে বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে আরও অনেক গভীর জলে নেমে অনুসন্ধান করব। অনেকেই জানেন সমুদ্রের গভীরতম অংশ কতখানি গভীর হতে পারে। প্রশান্ত মহাসাগরের এক একটা জায়গা ছ' মাইলেরও বেশি গভীর। অর্থাৎ গোটা মাউন্ট এভারেস্টটা তার মধ্যে ডুবে গিয়েও তার উপর প্রায় দু হাজার ফিট জল থাকবে।

আমরা অন্তত দশহাজার ফুট—অর্থাৎ ২ মাইল নীচে নামব বলে স্থির করেছি। এর চেয়ে বেশি গভীরে জলের যা চাপ হবে, তাতে আমাদের জাহাজকে টিকিয়ে রাখা মুশকিল হতে পারে।

এখন আমরা চলেছি পাঁচ হাজার ফুট নীচ দিয়ে। এখানে চিররাত্রি। দুপুরের সূর্য যদি ঠিক মাথার উপরেও থাকে, তা হলে তার সামান্যতম আলোও এখানে পৌঁছাবে না।

এখানে উদ্ভিদ বলে কিছু নেই, কারণ সূর্যের আলো ছাড়া উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না। কাজেই প্রবাল, প্ল্যাঙ্কটন ইত্যাদির যে শোভা এতদিন আমাদের ঘিরে ছিল, এখন আর তা দেখা যায় না। এখানে আমাদের ঘিরে আছে স্তরের পর স্তর জলমগ্ন পাথরের পাহাড়। এইসব পাহাড়ের পাশ দিয়ে পাশ দিয়ে আমরা চলেছি। নীচে জমিতে বালি আর পাথরের কুচি। তার উপরে স্থির হয়ে বসে আছে, না হয় চলে ফিরে বেড়াচ্ছে—শামুক ও কাঁকড়া জাতীয় প্রাণী। পাহাড়ের গায়ে গায়ে 'ক্ল্যাম' জাতীয় শামুক আটকে রয়েছে ঘুঁটের মতো। এক জাতীয় ভয়াবহ কাঁকড়া দেখলাম, তারা লম্বা লম্বা রণ-পার মতো পা ফেলে মাটি দিয়ে হেঁটে চলেছে।

এইসব প্রাণীর কোনওটাই উদ্ভিদজীবী নয়। এরা হয় পরস্পরকে খায়, না হয় অন্য সামুদ্রিক প্রাণী যখন মরে নীচে এসে পড়ে, তখন সেগুলোকে খায়। যারা এ জিনিসটা করে তাদের সামুদ্রিক শকুনি বললে খুব ভুল হবে না।

তানাকা এখন জাহাজ চালাচ্ছে। দুই জাপানিকেই এর আগে পর্যন্ত হাসিখুশি দেখেছি; এখন দুজনেই গম্ভীর। সার্চলাইট সব সময়ই জ্বালানো আছে। একবার নেভানো হয়েছিল। মনে হল যেন অন্ধকূপের মধ্যে রয়েছি। তবে, আলো নেভালে একটা জিনিস হয়। অন্ধকারে চলাফেরা করতে হবে বলেই বোধ হয়, এখানকার কোনও কোনও মাছের গা থেকে

www.BDeBooks.Com

আলো বেরোয়—আর তার এক একটার রং ভারী সুন্দর। এ আলো একেবারে 'নিয়ন' আলোর মতো। একটা মাছের নামই নিয়ন মাছ। জাহাজের আলো নেভাতে এরকম দু-একটা মাছকে জলের মধ্যে আলোর রেখা টেনে চলে বেড়াতে দেখা গেল। এমনিতে, এই গভীর জলের যে সমস্ত প্রাণী, তাদের গায়ের রঙের কোনও বাহার নেই। বেশির ভাগই হয় সাদা, না হয় কালো।

অবিনাশবাবু মন্তব্য করলেন, 'সমস্ত জগৎটার উপর একটা মৃত্যুর ছায়া পড়েছে বলে মনে হয়—তাই না ?'

কথাটা ঠিকই। শহর সভ্যতা পথ ঘাট মানুষ বাড়ি গাড়ি—এসব থেকে যেন লক্ষ মাইল দূরে আর লক্ষ বছর আগেকার কোনও আদিম বিভীষিকাময় জগতে চলে এসেছি আমরা। অথচ আশ্চর্য এই যে, এ জগৎ আসলে আমাদের সমসাময়িক, আর এখানেও জন্ম আছে মৃত্যু আছে খাওয়া আছে ঘুম আছে সংগ্রাম আছে সমস্যা আছে। তবে তা সবই একেবারে আদিম স্তরে—যেমন সত্যিই হয়তো লক্ষ বছর আগে ছিল।

তানাকা কী জানি একটা দেখে চীৎকার করে উঠল।

লেখা থামাই।

২৯শে জানুয়ারি, ভোর সাড়ে চারটা

এগারো হাজার ফুট থেকে আমরা আবার উপরে উঠতে আরম্ভ করেছি ; আমাদের অভিযান শেষ হয়েছে। আমরা সকলেই এখনও একটা মুহ্যমান অবস্থায় রয়েছি। এটা কাটতে, এবং মনের বিস্ময়টা যেতে বোধ হয় বেশ কিছুটা সময় লাগবে। আমার 'নাভাইটা' বড়ি খুব কাজ দিয়েছে। আমি যে এখন বসে লিখতে পারছি, সেও এই বড়ির গুণেই।

এর আগের দিনের লেখার শেষ লাইনে বলেছিলাম, তানাকা জানালা দিয়ে কী জানি একটা দেখে চিৎকার করে উঠেছিল। আমরা সবাই সে চিৎকার শুনে জানালার উপর প্রায় হুমড়ি দিয়ে পড়লাম।

তানাকা জাপানি ভাষায় কী জানি একটা বলাতে হামাকুরা জাহাজের সার্চলাইটটা নিভিয়ে দিল, আর নেভাতেই একটা আশ্চর্য দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ল।

আগেই বলেছি আমাদের চারিদিক ঘিরে রয়েছে সমুদ্রগর্ভের সব পাহাড়। এইরকম দুটো পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে বেশ খানিকটা দূরে (সমুদ্রের তলায় দূরত্ব আন্দাজ করা ভারী কঠিন) দেখতে পেলাম একটা অগ্নিকুণ্ডের মতো আলো। সে আলো আগুনের লেলিহান শিখার মতোই অস্থির, আর তার রংটা হল আমার দেখা লাল মাছের রঙের মতোই জ্বলন্ত উজ্জ্বল।

তানাকা জাহাজের স্টিয়ারিংটা ঘোরাতেই বুঝতে পারলাম সেই অগ্নিকুণ্ডের দিকেই চালিত হচ্ছি। সার্চলাইট আর জ্বালার দরকার নেই। ওই আলোই আমাদের পথ দেখাবে। তা ছাড়া আমাদের অস্তিত্বটা যত কম জাহির করা যায় ততই বোধ হয় ভাল।

অবিনাশবাবু আমার হাতের আস্তিনটা ধরে চাপা গলায় বললেন, 'মিলটনের প্যারাডাইজ লস্ট মনে আছে ? তাতে যে নরকের বর্ণনা আছে—এ যে কতকটা সেইরকম মশাই।'

আমি আমার বাইনোকুলারটা বার করে হামাকুরার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'দেখবে ?' ও মাথা নেড়ে বলল, 'ইউ রুক।'

বাইনোকুলারে চোখ লাগাতেই অগ্নিকুণ্ড কাছে এসে পড়ল। দেখলাম—সেটা আগুন নয়, সেটা মাছের মেলা। হাজার হাজার রক্তমাছ সেখানে চক্রাকারে ঘুরছে, পাক খাচ্ছে, উপরে উঠছে, নীচে নামছে। তাদের গায়ের রং লাল বললে ভুল হবে, আসলে তাদের গা থেকে

একটা লাল আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে, যার ফলে তাদের দূর থেকে একটা অগ্নিকুণ্ড বলে মনে হচ্ছে।

প্রথমে এ দৃশ্যের অনেকখানি পাহাড়ে ঢেকে ছিল। জাহাজ যতই এগোতে লাগল, ততই বেশি করে দেখা যেতে লাগল এই রক্তমাংসের জগৎ।

ঠিক দশ মিনিট চলার পর আমরা পাহাড়ের পাশ কাটিয়ে একেবারে খোলা জায়গায় এসে পড়লাম। মাছের ভিড় এখনও আমাদের থেকে অন্তত বিশ-পঁচিশ গজ দূরে, কিন্তু আর এগোনোর প্রয়োজন নেই, কারণ আমাদের দৃষ্টিপথে আর কোনও বাধা নেই। তা ছাড়া এটাও মনে হচ্ছিল, যে এই বিচিত্র অলৌকিক দৃশ্য যেন একটু দূর থেকে দেখাই ভাল।

মাছের সংখ্যা গুনে শেষ করার ক্ষমতা নেই—আর তার কোনও প্রয়োজনও নেই। এক মাছ আরেক মাছে কোনও তফাত নেই—সুতরাং তাদের যে কোনও একটার বর্ণনা দিলেই চলবে।

মাছ বলতে আমরা সাধারণত যে জিনিসটা বুঝি, এটা ঠিক সেরকম নয়। এর কাঁধের দুদিকে ডানার জায়গায় যে দুটো জিনিস আছে, তার সঙ্গে মানুষের হাতের মিল আছে, আর এরা সেগুলো দিয়ে হাতের কাজই করছে। লেজটা দুভাগ হয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু ভাগ হয়ে সেটা আর ঠিক লেজ নেই, হয়ে গেছে দুটো পায়ের মতো। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, এদের চোখ মাছের মতো চেয়ে থাকে না, এ চোখে মানুষের মতো পাতা পড়ে।

এদের চাঞ্চল্যেরও একটা কারণ আন্দাজ করা যায়, সেটা পরে বলছি। তার আগে বলা দরকার যে এরা পরস্পরের সঙ্গে যে ব্যবহার করছে, তাতে একটা স্পষ্ট ধারণা হয় যে এরা কথা বলছে, অথবা অন্ততপক্ষে এদের মধ্যে একটা ভাবের আদান প্রদান চলেছে।

হাত নেড়ে মাথা নেড়ে এরা যে ব্যাপারটা চালিয়েছে, সেটা কোনওরকম জলচর প্রাণী কখনও করে বলে আমার জানা নেই। তানাকা আর হামাকুরাকে বলাতে তারাও আমার সঙ্গে এ ব্যাপারে এক মত হল।

এদের সমস্ত উত্তেজনা যে ব্যাপারটাকে ঘিরে হচ্ছে সেটা একটা আশ্চর্য লাল গোলাকার বস্তু। গোলকটা সাইজে আমাদের জাহাজের প্রায় অর্ধেক। সেটা যে কীসের তৈরি তা বোঝা ভারী মুশকিল, যদিও সেটা যে ধাতু সে বিষয় কোনও সন্দেহ নেই। গোলকটা সমুদ্রের মাটিতে তিনটে স্বচ্ছ তেরচা খুঁটির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আরেকটা জিনিস লক্ষ করার মতো, এই রক্তমাছ ছাড়া আর কোনওরকম জ্যান্ত প্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। যেটা রয়েছে সেটা হল মাছের ভিড়ের কিছু দূরে পর্বতপ্রমাণ একটা কঙ্কাল। বুঝতে অসুবিধা হল না যে সেটা একটা তিমি মাছের। এই বিশাল মাছের এই দশা হল কী করে ?এই প্রশ্নের একটা উত্তরই মাথায় আসে : এই বিঘতপ্রমাণ মাছের দলই এই তিমিকে ভক্ষণ করেছে।

রক্তমাছের পিছনে যে পাহাড়, তার চেহারাতেও একটা বিস্ময়কর বিশেষত্ব রয়েছে। অন্যান্য পাহাড়ের গায়ের মতো এর গা এবড়োখেবড়ো নয়। তাকে নিপুণ কারিগরির সাহায্যে একই সঙ্গে সুন্দর ও বাসযোগ্য করে তোলা হয়েছে। তার গায়ে থাকে থাকে সারি সারি অসংখ্য সুড়ঙ্গ কাটা হয়েছে—যেগুলো পাহাড়ের ভিতর চলে গেছে। এই সুড়ঙ্গের ভিতরটা অন্ধকার নয়। এর প্রত্যেকটার ভিতরে আলোর ব্যবস্থা আছে। এই আলো লাল। অর্থাৎ এ রাজ্যের সবই লাল।

এই সব দেখতে দেখতে আমার মাথার ভিতরটা কেমন জানি করতে লাগল। চোখটা ধাঁধিয়ে গিয়েছিল অবশ্যই, কিন্তু মাথার এ ভাবটা সে কারণে নয়। একটা আশ্চর্য ধারণা হঠাৎ আমার মনে উদিত হবার ফলেই এই অবস্থা।

www.BDeBooks.Com

এরা যদি পৃথিবীর প্রাণী না হয় ? যদি এরা অন্য কোনও গ্রহ থেকে পৃথিবীতে এসে থাকে ? হয়তো তাদের নিজেদের গ্রহে আর জায়গায় কুলোচ্ছে না তাই পৃথিবীতে এসেছে বসবাস করতে ?

হামাকুরাকে কথাটা বলতে সে বলে উঠল, 'ওয়ানুদাফুরু ! ওয়ানুদাফুরু !'

আমার নিজেরও ধারণাটাকে ওয়ান্ডারফুল বলেই মনে হয়েছিল। শুধু তাই নয়—এটা সম্ভবও বটে। এ প্রাণী পৃথিবীতে সৃষ্টি হতে পারে না। হলে সেটা এতদিন মানুষের অজানা থাকত না। কারণ—বিশেষত—এরা যে শুধু জলের তলাতেই থাকে তা তো না, এরা উভয়চর। ডাঙায় উঠে এরা মানুষ মারতে পারে, ডাঙা থেকে হেঁটে এরা জলে নামতে পারে।

হামাকুরা হঠাৎ বলল, 'ওরা মুখ দিয়ে কোনও শব্দ করছে কি না, এবং সে শব্দের কোনও মানে আছে কি না সেটা জানা দরকার। শুশুক মাছ শিস দেয় সেটা বোধ হয় তুমি জান। সেই শিস রেকর্ড করে জানা গেছে যে সেটা একরকম ভাষা। ওরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে, মনের ভাব প্রকাশ করে। এরাও হয়তো তাই করছে।'

এই বলে হামাকুরা ক্যাবিনের দেয়ালের একটা ছোট দরজা খুলে তার ভিতর থেকে একটা হেডফোন জাতীয় জিনিস বার করে কানে পরল। তারপর টেবিলের উপর অনেকগুলো বোতামের মধ্যে দু-একটা একটু এদিক ওদিক ঘোরাতেই তার চোখে মুখে বিস্ময় ও উল্লাসের ভাব ফুটে উঠল। তারপর হেডফোনটা খুলে আমাকে দিয়ে বলল, 'শোনো'।

সেটা কানে লাগাতেই নানারকম অদ্ভুত তীক্ষ্ণ শব্দ শুনতে পেলাম। তার মধ্যে একটা বিশেষ শব্দ যেন বারবার উচ্চারিত হচ্ছে—ক্লী ক্লী ক্লী ক্লী ক্লী ক্লী ...এটা কি শুধুই শব্দ—না এর কোনও মানে আছে ?

অবিনাশবাবু দেখি এর ফাঁকে আমার লিঙ্গুয়াগ্রাফ যন্ত্রটা বার করে আমার দিকে এগিয়ে ধরে বসে আছেন। এরকম বুদ্ধি নিয়ে তো উনি অনায়াসে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে যেতে পারেন !

কিন্তু কোনও ফল হল না। কোনও শব্দেরই কোনও মানে আমার যন্ত্রে লেখা হল না। অথচ যন্ত্র খারাপ হয়নি, কারণ জাপানি ভাষায় অনুবাদ গড়গড় করে হয়ে যাচ্ছে। কী হল তা হলে ?

হামাকুরা বলল, 'এর মানে একমাত্র এই হতে পারে, যে ওরা যে কথা বলছে তার কোনও প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় নেই। অর্থাৎ ওদের ভাষা আর ওদের ভাব—দুটোই মানুষের চেয়ে আলাদা। এতে আরও বেশি মনে হয় যে ওরা অন্য কোনও গ্রহের প্রাণী।'

যন্ত্রটা রেখে দিলাম। কী বলছে সেটা জানার চেয়ে কী করছে সেটা দেখাই ভাল।

রক্তমৎস্যের দৃষ্টিশক্তি বোধ হয় তেমন জোরালো নয়, কারণ আমাদের জাহাজটা তারা এখনও দেখতে পায়নি।

তাই কী ? নাকি, ওদের মধ্যে কোনও একটা কারণে এমন উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে যে ওদের আশেপাশে কী আছে না আছে সেদিকে ওরা ভ্রূক্ষেপই করছে না ? বিনা কারণে এমন চাঞ্চল্য কোনও প্রাণী প্রকাশ করতে পারে সেটা বিশ্বাস করা কঠিন।

এটা ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ মাছের হাবভাবে একটা পরিবর্তন লক্ষ করলাম। তারা হঠাৎ দুই দলে ভাগ হয়ে গেল ; তারপর দুই দল গোলকটার দুদিকে গিয়ে সেটাকে যেন বারবার ধাক্কা মেরে সরাতে চেষ্টা করতে লাগল। তারপর দেখি তারা গোলকটাকে চারপাশ থেকে ঘিরে একই সঙ্গে সেটার দিকে চার্জ করে গিয়ে তাতে ঠেলা মারছে।

এ জিনিসটা তারা প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে করল। তারপরেই এক মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটতে

দেখলাম। দল থেকে একটি একটি করে মাছ ছটফট করতে করতে যেন নির্জীব হয়ে মাটিতে পড়ে যেতে লাগল। হঠাৎ যেন কীসে তাদের প্রাণশক্তি হরণ করে নিচ্ছে। সেটা কি ক্লান্তি, বা কোনও ব্যারাম বা অন্য কিছু ?

একটু চিন্তা করতেই বিদ্যুতের একটা ঝলকের মতো সমস্ত জিনিসটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

অন্য কোনও গ্রহ থেকে এই উভয়চর প্রাণীরা এসেছে পৃথিবীতে বসবাস করতে। জলের ভাগ এখানে বেশি, তাই জলেই নেমেছে—কিংবা হয়তো জলেই থাকবে বলে এসেছে। তারপর, হয় জলের তাপ, বা জলে কোনও গ্যাস বা ওই জাতীয় কিছুর অভাব বা অতিরিক্ততা এদের জীবনধারণের পথে বাধার সৃষ্টি করেছে। তাই এদের কেউ কেউ জল থেকে ডাঙায় উঠে দেখতে গেছে সেখানে বসবাস করা যায় কি না। ডাঙায় উঠে দেখেছে মানুষকে। হয়তো ধারণা হয়েছে মানুষ তাদের শত্রু, তাই আত্মরক্ষার জন্য তাদের কয়েকজনকে কামড়িয়ে বা হুল ফুটিয়ে মেরেছে। তারপর তারা জলে ফিরে এসে ক্রমে বুঝতে পেরেছে যে পৃথিবীতে থাকলে তারা বেশিদিন বাঁচতে পারবে না। খুব সম্ভবত ওই লাল গোলকে করেই তারা এসেছিল, আবার ওতে করেই তারা ফিরে যেতে চায়। দুর্ভাগ্যবশত গোলকটা সমুদ্রের মাটিতে এমন ভাবে আটকে গেছে যে সেটাকে ওপরে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। এই মুহূর্তে সে গোলকটাকে আলগা করতে না পারলে হয়তো তাদের সকলেরই সলিলসমাধি হবে।

হামাকুরাকে বললাম, 'ওই গোলকটাকে যে করে হোক মাটি থেকে আলগা করে দিতে হবে। এদের সাধ্যি আছে বলে মনে হয় না।'

হামাকুরা তানাকাকে জাপানি ভাষায় তাড়াতাড়ি কী জানি বলে বলল, 'আমাদের জাহাজটাকে দিয়ে ওটাকে ধাক্কা মারা ছাড়া কোনও উপায় নেই।'

'তবে সেটাই করা হোক।'

চোখের সামনে একের পর এক মাছ মরে পাক খেতে খেতে মাটিতে পড়ছে—এ দৃশ্য আমি আর দেখতে পারছিলাম না।

তানাকা জাহাজটাকে চালু করে খুব আস্তে এবং সাবধানে গোলকটার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। যখন হাতদশেকের মধ্যে এসে পড়েছি তখন আরেক বিদ্‌ঘুটে ব্যাপার শুরু হল। মাছগুলো হঠাৎ তাদের ভিড়ের মধ্যে জাহাজটাকে ঢুকতে দেখে বোধ হয় ভাবল কোনও শত্রু তাদের সর্বনাশ করতে এসেছে। তারা দলে দলে আমাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে আমাদের ক্যাবিনের তিনকোনা জানালার কাচে এসে ধাক্কা মারতে আরম্ভ করল। সে এক দৃশ্য ! সমস্ত ক্যাবিনের ভিতরটা লাল আভায় ধক ধক করছে। মাছের পর মাছ এসে মরিয়া হয়ে জানালায় ঠোক্কর মারছে—তাদের দৃষ্টিতে একটা হিংস্র অথচ ভয়ার্ত ভাব।

নিউটনের যা দশা হল তা লিখে বোঝানো মুশকিল। মুখ দিয়ে ক্রমাগত ফ্যাঁস ফ্যাঁস শব্দ, আর সামনের পায়ের দুই থাবা দিয়ে অনবরত কাচের উপর আঁচড়। অবিনাশবাবুর দিকে চেয়ে দেখি উনি চোখ বুজে বিড়বিড় করে ইষ্টনাম জপ করছেন—তাঁর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে তার উপর মাছের লাল আলো পড়ে এক অদ্ভুত গোলাপি ভাব।

একটা মৃদু ধাক্কা অনুভব করে বুঝলাম আমাদের জাহাজ গোলকের গায়ে ঠেকেছে। তার কয়েক সেকেন্ড পর তানাকা জাহাজটাকে পিছিয়ে আনতে আরম্ভ করল। খানিকটা পিছোতেই দেখলাম গোলকটা মাটি থেকে আলগা হয়ে ভাসমান অবস্থায় জলের মধ্যে দুলছে।

এবার এক অভাবনীয় দৃশ্য। গোলকের তলার দিকে যে একটা দরজা ছিল সেটা আগে বুঝতে পারিনি। যত জ্যান্ত মাছ বাকি ছিল, সব দেখি এবার একসঙ্গে আমাদের জাহাজ ছেড়ে

www.BDeBooks.Com

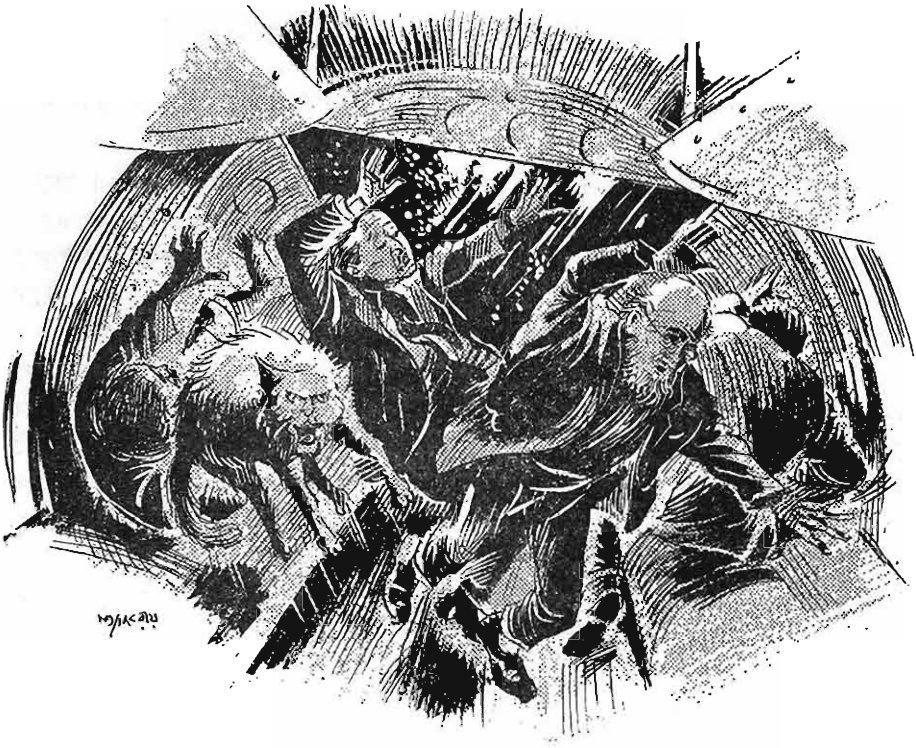

বিদ্যুদ্বেগে গোলকের তলায় গিয়ে হুড়মুড় করে দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপর যেটা হল, তার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত ছিল, কিন্তু আমরা ছিলাম না। একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম গোলকটা তিরবেগে উপর দিকে উঠছে। সেই বিস্ফোরণের ফলে জলের চাপ এসে আমাদের জাহাজে মারল ধাক্কা, আর সেই ধাক্কার চোটে জাহাজ ফুটবলের মতো ছিটকে গিয়ে লাগল পিছনে পাহাড়ে।

তারপর আমার আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান হল তখন বুঝলাম নিউটন আমার কান চাটছে। ক্যাবিনের মেঝে থেকে উঠে অনুভব করলাম কাঁধে একটা যন্ত্রণা। হামাকুরা দেখি তানাকার মাথায় একটা ব্যান্ডেজ বাঁধছে। অবিনাশবাবু ছিটকে গিয়ে একটা বিছানার উপর পড়েছিলেন ; তাই বোধ হয় ওঁর তেমন চোট লাগেনি। ওঁকে দেখে মনে হল উনি বেশ নিশ্চিন্ত ভাবেই ঘুমোচ্ছেন। কাঁধে একটা মৃদু চাপ দিতেই ধড়মড় করে উঠে বসে চোখ বড় বড় করে বললেন, 'এক্স-রেতে কী বলছে ?' বুঝলাম উনি স্বপ্ন দেখছিলেন যে ওঁর হাড়গোড় সব ভেঙে গেছে।

জাহাজ উপর দিকে উঠছে। কারিগরীর আশ্চর্য বাহাদুরি এই জাপানিদের। এত বড় একটা ধাক্কায় জাহাজটা কিছুমাত্র জখম হয়নি। বাইরে যদি বা কিছু হয়ে থাকে, সেটা নিশ্চয় মারাত্মক নয়। আর ভেতরে শুধু একটা প্ল্যাস্টিকের গেলাস উলটে গিয়ে খানিকটা জল আমার বিছানায় পড়েছে—ব্যস।

হামাকুরা বলল, 'প্রথমবার যে ধাক্কা খেয়েছিলাম, সেটা বোধ হয় অন্য আরেকটা গোলকের বিস্ফোরণ।'

আমি বললাম, 'সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমার মনে হয় এরা সবাই একই সঙ্গে, যেখান থেকে এসেছিল সেখানে আবার ফিরে যাচ্ছে।'

কোন গ্রহ থেকে এরা এসেছিল সেটা কোনওদিন জানা যাবে কি ? বোধ হয় না। তবে এই ভিন্নগ্রহবাসী রক্তমৎস্য যে বিজ্ঞানে কতদূর অগ্রসর হয়েছে সেটা ভাবতে অবাক লাগে। তানাকা এ মাছের অনেক ছবি তুলেছে। আমি যখন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম, সে সময় জাহাজ ছাড়ার আগে হামাকুরা বাইরে বেরিয়ে দুটো মরা মাছের নমুনা নিয়ে এসেছে। মোটকথা, আমাদের অভিযান মোটেই ব্যর্থ হয়নি।

অবিনাশবাবুর দিকে চেয়ে দেখি তিনি অন্যমনস্কভাবে জানালার বাইরে তাকিয়ে গুন গুন করে গান গাইছেন। আমি বললাম, 'সমুদ্রগর্ভে এই অভিযানটা আপনার কাছে বেশ উপভোগ্য হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'মাছ জিনিসটা যেরকম উপাদেয়, মাছের জগৎটা যে উপভোগ্য হবে তাতে আর আশ্চর্য কী।'

'আমার তো মনে হচ্ছে আমার জ্ঞানের ভাণ্ডার আরও অনেক ভরে উঠল।'

'আপনি ভাবছেন জ্ঞান, আর আমি ভাবছি পকেট।'

'কী রকম ?' আমি অবাক হয়ে অবিনাশবাবুর দিকে চাইতেই ভদ্রলোক তাঁর পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা চাপবাঁধা ডেলা বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। সেটা হাতে নিয়ে ভাল করে আলোতে দেখেই আমার চোখ কপালে উঠল।

সেই ডেলার মধ্যে রয়েছে অন্তত দশখানা আরবি ভাষায় ছাপ মারা মোগল আমলের সোনার মোহর !

সন্দেশ। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫

প্রোফেসর শঙ্কু ও কোচাবাম্বার গুহা

৭ই আগস্ট

আজ আমার পুরনো বন্ধু হনলুলুর প্রোফেসর ডাম্‌বার্টনের একটা চিঠি পেয়েছি। তিনি লিখছেন—

প্রিয় শ্যাঙ্কস,

খামের উপর ডাকটিকিট দেখেই বুঝতে পারবে যে বোলিভিয়া থেকে লিখছি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকেও যে সভ্য সমাজের উপকার হতে পারে তার আশ্চর্য প্রমাণ এখানে এসে পেয়েছি। সেটার কথা তোমাকে জানানোর জন্যেই এই চিঠি।

গত জুন মাসে বোলিভিয়ায় যে ভূমিকম্প হয়েছিল তার খবর তোমার গিরিডিতেও নিশ্চয়ই পৌঁছেছে। এই ভূমিকম্পের ফলে এখানকার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর কোচাবাম্বা থেকে প্রায় একশো মাইল দূরে একটা বিশাল পাহাড়ের বৃহত্তম একটা অংশ চিরে দুভাগ হয়ে একটা

www.BDeBooks.Com

যাতায়াতের পথ তৈরি হয়ে যায়। এই পাহাড়ের পিছন দিকটায় এর আগে কোনও মানুষের পা পড়েনি (বোলিভিয়ার অনেক অংশই ভূতাত্ত্বিকদের কাছে এখনও অজানা তা তুমি জানো)। যাই হোক, এই পাহাড়ের কাছাকাছি একটা গ্রামের কিছু ছেলে লুকোচুরি খেলতে খেলতে এই নতুন পথ দিয়ে অনেকখানি এগিয়ে যায়। তাদের মধ্যে একজন পাহাড়ের গায়ে একটি গুহার মধ্যে লুকোনোর জন্য ঢোকে, এবং ঢুকেই তার ভিতরের দেয়ালে আঁকা রঙিন ছবি দেখতে পায়।

আমি গত শনিবার পেরুতে একটা কনফারেন্সে যাবার পথে বোলিভিয়ায় আসি ভূমিকম্পের কীর্তি চাক্ষুষ দেখার জন্য। আসার পরদিনই স্থানীয় ভূতাত্ত্বিক প্রোফেসর কর্ডোবার কাছে গুহার খবরটা শুনি, এবং সেইদিনই গিয়ে ছবিগুলো দেখে আসি। আমার মনে হয় তোমারও একবার এখানে আসা দরকার। ছবিগুলো দেখবার মতো। কর্ডোবার সঙ্গে আমার মতভেদ হচ্ছে। তোমার সমর্থন পেলে (নিশ্চয়ই পাব!) মনে কিছুটা জোর পাব। চলে এসো। পেরুতে বলে দিয়েছি—তোমার নামে কনফারেন্সের একটা আমন্ত্রণ যাচ্ছে। তারাই তোমার যাতায়াতের খরচ দেবে।

আশা করি ভাল আছ। ইতি—

হিউগো ডাম্‌বার্টন

আমার যাওয়ার লোভ হচ্ছে দুটো কারণে। প্রথমত, দক্ষিণ আমেরিকার এ অঞ্চলটা আমার দেখা হয়নি। দ্বিতীয়ত, স্পেনের বিখ্যাত আলতামিরা গুহার ছবি দেখার পর থেকেই আদিম মানুষ সম্পর্কে আমার মনে নানারকম প্রশ্ন জেগেছে। পঞ্চাশ হাজার বছর আগের মানুষ—যাদের সঙ্গে বাঁদরের তফাত খুব সামান্যই—তাদের হাত দিয়ে এমন ছবি বেরোয় কী করে তা এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। এক একটা ছবি দেখে মনে হয়, আজকের দিনের আর্টিস্টও এত ভাল আঁকতে পারে না; অথচ এরা নাকি ভাল করে সোজা হয়ে হাঁটতেও পারত না!

নেহাতই যদি বোলিভিয়া যাওয়া হয়, তা হলে সঙ্গে আমার নতুন তৈরি 'অ্যানিস্থিয়াম' পিস্তলটা নেব, কারণ যে জায়গায় এর আগে মানুষের পা পড়েনি সেখানে নানারকম অজানা বিপদ লুকিয়ে থাকতে পারে। অ্যানিস্থিয়াম পিস্তলের ঘোড়া টিপলে তার থেকে একটা তরল গ্যাস তিরের মতো বেরিয়ে শত্রুর গায়ে লেগে তাকে বেশ কয়েক ঘন্টার জন্য অজ্ঞান করে দিতে পারে।

এখন অপেক্ষা শুধু পেরুর নেমন্তন্নের জন্য।

১৮ই আগস্ট

বোলিভিয়ার কোচাবাম্বা শহর থেকে একশো ত্রিশ মাইল দূরে ভূমিকম্পের ফলে আবিষ্কৃত গুহার বাইরে বসে আমার ডায়রি লিখছি। হাত দশেক দূরে মাটিতে প্রায় সমতল পাথরের উপর চিত হয়ে শুয়ে আছে ডাম্‌বার্টন, তার হাতদুটো ভাঁজ করে মাথার নীচে রাখা, তার সাদা কাপড়ের টুপিটা সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য মুখের উপর ফেলা।

এখন বিকেল চারটে। দিনের আলো ম্লান হয়ে আসছে। আর মিনিট কুড়ির মধ্যে সূর্য নেমে যাবে পাহাড়ের পিছনে। এ জায়গাটাকে ঘিরে একটা অস্বাভাবিক, আদিম নিস্তব্ধতা। মানুষের পা যে এর আগে এদিকে পড়েনি, সেটা আশ্চর্যভাবে অনুভব করা যায়। মানুষ বলতে যে আমি সভ্য মানুষ বলছি সেটা বলাই বাহুল্য, কারণ আদিম মানুষ যে এককালে

এখানে ছিল তার প্রমাণ আমাদের পাশের গুহাতেই রয়েছে। বোলিভিয়ার ভূমিকম্পের দৌলতে ক্রমে পৃথিবীর লোকে এই আশ্চর্য গুহার কথা জানতে পারবে। আলতামিরার গুহা আমি নিজে দেখেছি ; ফ্রান্সের লাস্‌কো গুহার ছবি বইয়ে দেখেছি। কিন্তু বোলিভিয়ার এ গুহার সঙ্গে ও দুটোর কোনও তুলনাই হয় না।

প্রথমত, ছবি সংখ্যায় অনেক বেশি। গুহার ভিতরে ঢুকলেই এক মেঝেতে ছাড়া আর সর্বত্র ছবি চোখে পড়ে। গুহার মুখ থেকে প্রায় একশো গজ ভিতরে পর্যন্ত ছবি রয়েছে। তারপর থেকে গুহাটা হঠাৎ সরু হয়ে গিয়েছে—হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হয়। সেইভাবে বেশ খানিকটা পথ এগিয়েও আমরা আর কোনও ছবি দেখতে পাইনি। মনে হয় ছবির শেষ ওই একশো গজেই। কিন্তু গুহাটা যেহেতু চওড়ায় বেশ অনেকখানি, এই একশো গজের মধ্যেই ছবির সংখ্যা হবে আলতামিরার প্রায় দশগুণ।

এ ছবিতে আঁকার গুণ ছাড়াও আরও অনেক অবাক করা ব্যাপার আছে। আদিম মানুষ গুহার দেয়ালে সাধারণত শিকারের ছবিই আঁকত। জন্তুজানোয়ার যা আঁকত তা সবই তাদের শিকারের জিনিস। তা ছাড়া, মানুষ বল্লম দিয়ে জানোয়ার মারছে, এমন ছবিও দেখা যায়। এখানেও শিকারের ছবি আছে, কিন্তু সে ছাড়াও এমন ছবি আছে যার সঙ্গে শিকারের কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না ; যেমন, গাছপালা ফুল পাখি পাহাড় চাঁদ ইত্যাদি। বোঝাই যায় এসব জিনিস ভাল লেগেছে বলে আঁকা হয়েছে। আর কোনও কারণ নেই। ছবির ফাঁকে ফাঁকে এক ধরনের হিজিবিজি নকশা বা অক্ষরের মতো জিনিস লক্ষ করলাম যার কোনও মানে করা যায় না। সব মিলিয়ে এটা বোঝা যায় যে, এরা বেশ একটা বিশেষ ধরনের আদিম মানুষ ছিল।

আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হল এইসব ছবির রং। এই রঙের এত বাহার আর এত জৌলুস যা নাকি অন্য কোনও প্রাগৈতিহাসিক গুহার ছবিতে নেই। বোধ হয় এরা কোনও বিশেষ ধরনের পাকা রং ব্যবহার করত। মোটকথা ছবিগুলোকে হঠাৎ দেখলে দশ-বারো বছরের বেশি পুরনো নয় বলেই মনে হয়। অথচ স্বভাবতই ছবির জানোয়ারগুলো ফ্রান্স বা স্পেনের মতোই সবই প্রাগৈতিহাসিক। আদিম বাইসন, বিরাট বাঁকানো দাঁতওয়ালা বাঘ—এই সব কিছুরই অজস্র অদ্ভুত ছবি এই গুহাতে আছে। এছাড়া আরেকরকম জানোয়ারের ছবি লক্ষ করলাম যেটা আমাদের দুজনের কাছেই একেবারে নতুন বলে মনে হল। এর গলাটা লম্বা, নাকের উপর গণ্ডারের মতো শিং, আর সারা পিঠময় শজারুর মতো কাঁটা। একটা মোটা ল্যাজও আছে, বোধ হয় কুমিরের ল্যাজের মতো। সব মিলিয়ে ভারী উদ্ভট চেহারা।

আমি আজ সারাদিন আমার 'ক্যামেরাপিড' দিয়ে গুহার ছবির ছবি তুলেছি। এই ক্যামেরা আমারই তৈরি। এতে রঙিন ছবি তোলা যায়, আর তোলার পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে প্রিন্ট হয়ে বেরিয়ে আসে। হোটেলে ফিরে গিয়ে ছবিগুলো নিয়ে বসব।

গুহার বাইরে এসে চারিদিকে চাইলে বেশ বোঝা যায় কেন এদিকটায় মানুষ এতদিন আসতে পারেনি। এ জায়গাটার তিনদিক ঘিরে খাড়াই স্লেটপাথরের পাহাড়। এই পাহাড়ের গা অস্বাভাবিক রকম মসৃণ, ঝোপঝাড় গাছপালা নেই বললেই চলে। অন্য দিকে—অর্থাৎ উত্তর দিকে—দুর্ভেদ্য জঙ্গল। আমরা যেখানে বসে আছি সেখান থেকে জঙ্গলের দূরত্ব প্রায় আধমাইল তো হবেই। জঙ্গলের পিছনে দূরে অ্যান্ডিজ পর্বতশ্রেণী দেখা যায়, তার মাথায় বরফ। গুহার আশেপাশে গাছপালা বিশেষ নেই, তবে বড় বড় পাথরের চাঁই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে, তার এক একটা পঞ্চাশ-ষাট ফুট উঁচু। পোকামাকড়ের অভাব নেই এখানে, তবে পাখি জিনিসটা এখনও চোখে পড়েনি ; হয়তো জঙ্গলের ভিতরে আছে। একটু আগে একটা ফুট চারেক লম্বা আরমাডিলো বা পিঁপড়েখোর জানোয়ার ডাম্‌বার্টনের খুব কাছ

www.BDeBooks.Com

দিয়ে হেঁটে গিয়ে একটা পাথরের ঢিপির পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সব কিছু মিলিয়ে এখানকার পরিবেশটা একেবারে আদিম, আর তাই গুহার ছবিগুলোর বাহার এত অবাক করে দেয়।

একটা কথা বলে রাখা ভাল—এখানকার বৈজ্ঞানিক প্রোফেসর পোরফিরিও কর্ডোবা আমাদের এই গুহা অভিযানের ব্যাপারটা খুব ভাল চোখে দেখছেন না। তার একটা কারণ হয়তো এই যে, তাঁর সঙ্গে আমাদের গভীর মতভেদ হচ্ছে। কর্ডোবা বললেন—

'তোমরা এই গুহাটাকে প্রাগৈতিহাসিক বলছ কী করে জানি না। আমার মনে হয় এর বয়স খুব বেশি হলে হাজার বছর। পঞ্চাশ হাজার বছরের পুরনো গুহার ছবির রং এত উজ্জ্বল হবে কী করে?'

কর্ডোবার কথা বলার ঢং বেশ রুক্ষ—অনেকটা তার চেহারার মতোই। এত ঘন ভুরু কোনও লোকের আমি দেখিনি।

আমি বললাম, 'দেয়ালে যে সব প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর ছবি রয়েছে, সেগুলো কী করে এল?'

কর্ডোবা হেসে বললেন, 'মানুষের কল্পনায় আজকের দিনেও হাতির গায়ে লোম গজাতে পারে। ওতে কিস্যু প্রমাণ হয় না। আমাদের দেশের ইন্‌কা সভ্যতার কথা শুনেছ তো? ইন্‌কাদের আঁকা ছবির কোনও জানোয়ারের সঙ্গে আসল জানোয়ারের হুবহু মিল নেই। তা হলে কি সে সব জানোয়ারকে প্রাগৈতিহাসিক বলতে হবে? ইন্‌কা সভ্যতার বয়স হাজার বছরের বেশি নয় মোটেই।'

আমি কিছু না বললেও, ডাম্‌বার্টন একথার উত্তর দিতে কসুর করল না। সে বলল, 'প্রোফেসর কর্ডোবা, আলতামিরার গুহা যখন প্রথম আবিষ্কার হয়, তখনও সেটাকে অনেক বৈজ্ঞানিকেরা প্রাগৈতিহাসিক বলে মানতে চাননি। পরে কিন্তু তাঁদের ভারী অপ্রস্তুত হতে হয়েছিল!'

এর উত্তরে কর্ডোবা কিছু বলেননি। কিন্তু তিনি যে আমাদের এই অভিযানে মোটেই সন্তুষ্ট নন সেকথা আঁচ করতে অসুবিধা হয়নি।

যাই হোক, আমরা কর্ডোবাকে অগ্রাহ্য করেই কাজ চালিয়ে যাব। আজকের কাজ এখানেই শেষ। এবার শহরে ফেরা উচিত।

১৮ই আগস্ট, রাত বারোটা

গুহা থেকে শহরের হোটেলে ফিরেছি রাত সাড়ে নটায়। ডিনার খেয়ে ঘরে এসে গত দুঘণ্টা ধরে আমার আজকের তোলা ছবিগুলো খুব মন দিয়ে দেখেছি। প্রাকৃতিক জিনিসের ছবির চেয়েও যেগুলো সম্পর্কে বেশি কৌতূহল হচ্ছে সে হল ওই হিজিবিজিগুলো নিয়ে। অনেকগুলো হিজিবিজির ছবি পাশাপাশি রেখে তাদের মধ্যে কিছু কিছু মিল লক্ষ করেছি। এমনকী এ সন্দেহও মনে জাগে যে, হয়তো এগুলো আসলে অক্ষর বা সংখ্যা। তাই যদি হয়, তা হলে তো এদের শিক্ষিত অসভ্য বলতে হয়! অবিশ্যি এটা অনুমান মাত্র; আসলে হয়তো এগুলো এইসব আদিম মানুষের কুসংস্কার সংক্রান্ত কোনও সাংকেতিক চিহ্ন।

এ নিয়ে কাল ডাম্‌বার্টনের সঙ্গে আলোচনা করা দরকার।

১৯শে আগস্ট, রাত এগারোটা

হোটেলের ঘরে বসে ডায়রি লিখছি। আজ বোধ হয় এদের পরবটরব আছে, কারণ কোত্থেকে যেন গানবাজনা আর হইহল্লার শব্দ ভেসে আসছে। মিনিট পাঁচেক আগে একটা মৃদু ভূমিকম্প হয়ে গেল। একটা বড় ভূমিকম্পের পর কিছুদিন ধরে মাঝে মাঝে অল্প ঝাঁকুনির ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়।

আজকের রোমাঞ্চকর ঘটনার পর বেশ ক্লান্ত বোধ করছি ; কিন্তু তাও এইবেলা ব্যাপারটা লিখে ফেলা ভাল। আগেই বলে রাখি—রহস্য আরও দশগুণ বেড়ে গেছে। আর তার সঙ্গে একটা আতঙ্কের কারণ দেখা দিয়েছে, যেটা ডাম্‌বার্টনের মতো জাঁদরেল আমেরিকানকেও বেশ ভাবিয়ে তুলেছে।

আগেই বলেছি, কোচাবাম্বা থেকে গুহাটা প্রায় একশো ত্রিশ মাইল দূরে। রাস্তা ভাল থাকলে এ পথ তিন ঘণ্টায় অতিক্রম করা সম্ভব হত। কিন্তু ভূমিকম্পের ফলে রাস্তা অনেক জায়গায় বেশ খারাপ হয়ে আছে, ফলে চার ঘণ্টার কমে জিপে যাওয়া যায় না। ফাটলের মুখে এসে জিপ থেকে নেমে বাকি পথটা (দশ মিনিটের মতো) পাথর ডিঙিয়ে হেঁটে যেতে হয়।

এই কারণে আমরা ঠিক করেছিলাম যে ভোর ছ'টার মধ্যে আমাদের অভিযানে বেরিয়ে পড়ব।

হোটেল থেকে যখন জিপ রওনা দিল, তখন ঠিক সোয়া ছটা। সূর্য তখনও পাহাড়ের পিছনে। আজ সঙ্গে আমরা একটি স্থানীয় স্প্যানিশ লোককে নিয়েছিলাম—নাম পেদ্রো। উদ্দেশ্য ছিল আমরা যখন গুহার ভিতরে ঢুকব, তখন সে বাইরে থেকে পাহারা দেবে। কারণ কিছু জিনিসপত্র খাবারদাবার ইত্যাদি বাইরে রাখলে আমাদের চলাফেরা আরও সহজ হতে পারবে। আমরা কিছু না বলাতেও দেখলাম পেদ্রো তার সঙ্গে একটি বন্দুক নিয়ে এগোচ্ছে। কেন জিজ্ঞেস করাতে সে বললে, 'সিনিওর, এখানকার জঙ্গল থেকে কখন যে কী বেরোয় তা বলা যায় না। তাই এটা আমার আত্মরক্ষার জন্যই এনেছি।'

ত্রিশ মাইল গাড়ি যাবার পর হঠাৎ খেয়াল হল যে, আমাদের পিছন পিছন আরেকটা গাড়ি আসছে, এবং সেটা যেন আমাদের গাড়িটার নাগাল পাবার জন্য বেশ জোরেই এগিয়ে আসছে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই গাড়িটা (সেটাও একটা জিপ) আমাদের পাশে এসে পড়ল। গাড়ির মধ্যে থেকে দেখি প্রোফেসর কর্ডোবা হাত বাড়িয়ে আমাদের থামতে বলছেন।

অগত্যা থামলাম, এবং দুজনেই গাড়ি থেকে রাস্তায় নামলাম। অন্য জিপটা থেকে কর্ডোবা নেমে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। তার মধ্যে একটা স্পষ্ট উত্তেজনার ভাব লক্ষ করলাম।

কর্ডোবা আমাদের দুজনকে গম্ভীরভাবে নমস্কার জানিয়ে বলল, 'আমার ড্রাইভার তোমার ড্রাইভারকে জানে। তার কাছ থেকেই জানলাম তোমরা ভোরে ভোরে বেরিয়ে পড়বে। আমি এসেছি তোমাদের সাবধান করে দিতে।'

আমরা দুজনেই অবাক। বললাম, 'কী ব্যাপারে সাবধান হতে বলছ ?'

কর্ডোবা বলল, 'গুহার উত্তর দিকের জঙ্গলটা খুব নিরাপদ নয়।'

ডাম্‌বার্টন বলল, 'কী করে জানলে ?'

কর্ডোবা বলল, 'আমি প্রথম যেদিন গুহাটা দেখতে যাই, সেদিন জঙ্গলটাতেও ঢুকেছিলাম। আমার ধারণা হয়েছিল যে, ছবিগুলো খুব অল্প কদিন আগে আঁকা, এবং

www.BDeBooks.Com

জঙ্গলের মধ্যেই বোধ হয় ছবির রঙের উপাদানগুলো পাওয়া যাবে। হয়তো কোনও বিশেষ গাছের রস থেকে বা কোনওরকম পাথর জলে ঘষে রংগুলো তৈরি হয়েছে।'

'তার কোনও হদিস পেয়েছিলে কি ?'

'না। কারণ, বেশি ভিতরে ঢোকার সাহস হয়নি। জঙ্গলের মাটিতে কিছু পায়ের ছাপ দেখে ভয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম।'

'কী রকম পায়ের ছাপ ?'

'অতিকায় জানোয়ারের। কোনও জানা জন্তুর পায়ের ছাপ ওরকম হয় না।'

ডাম্‌বার্টন হেসে বলল, 'ঠিক আছে। আমাদের সতর্ক করে দেবার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমাদের সঙ্গে অস্ত্রধারী লোক আছে। তা ছাড়া গুহায় আমাদের যেতেই হবে। এমন সুযোগ আমরা ছাড়তে পারব না। কী বলো শ্যাঙ্কস্ ?'

আমি মাথা নেড়ে ডাম্‌বার্টনের কথায় সায় দিয়ে বললাম, 'সাধারণ অস্ত্র ছাড়াও অন্য অস্ত্র আছে আমাদের কাছে। একটা আস্ত ম্যামথকে তা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই শায়েস্তা করতে পারবে।'

কর্ডোবা বলল, 'বেশ। আমার কর্তব্য আমি করে গেলাম, কারণ দেশটা আমারই, তোমরা এখানে অতিথি। তোমাদের কোনও অনিষ্ট হলে আমার উপরে তার খানিকটা দায়িত্ব এসে পড়তে পারে তো! তবে তোমরা নেহাতই যখন আমার নিষেধ মানবে না, তখন আর আমি কী করতে পারি বলো? আমি আসি। তোমরা বরং এগোও!'

কর্ডোবা তাঁর জিপে উঠে উলটোমুখো শহরের দিকে চলে গেলেন, আর আমরাও আবার রওনা দিলাম গুহার দিকে।

কিছুদূর যাবার পর সামনের সিট থেকে পেদ্রো হঠাৎ আমাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'ভূমিকম্পের দিন প্রোফেসর কর্ডোবার কী হয়েছিল আপনারা শুনেছেন কি ?'

বললাম, 'কই, না তো। কী হয়েছিল ?'

পেদ্রো বলল, 'সেদিন ছিল রবিবার। প্রোফেসর সকালে উঠে গির্জায় যাচ্ছিলেন। গির্জার গেট দিয়ে ঢুকবার সময় ভূমিকম্পটা শুরু হয়। প্রোফেসরের চোখের সামনে সান্তা মারিয়া গির্জা ধূলিসাৎ হয়ে যায়, আর প্রায় ৩০০ লোক পাথর চাপা পড়ে মারা যায়। আর দশ সেকেন্ড পরে হলে প্রোফেসরেরও ওই দশা হত।'

আমরা বললাম, 'সে তো ওর খুব ভাগ্য ভাল বলতে হবে।'

পেদ্রো বলল, 'তা ঠিক, কিন্তু ওই ঘটনার পর থেকে প্রোফেসরের মাথা মাঝে মাঝে বিগড়ে যায়। আজ যে জন্তুর কথা বলছিলেন, মনে হয় সেটা একেবারে মনগড়া। ও জঙ্গলে যা জন্তু আছে, তা বোলিভিয়ার সব জঙ্গলেই আছে।'

আমি আর ডাম্‌বার্টন পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। দুজনেরই মনে এক ধারণা : কর্ডোবা চান না যে আমরা গুহায় গিয়ে কাজ করি। অর্থাৎ, খুব সম্ভবত তিনি চাইছেন যে গুহায় যদি কোনও আশ্চর্য তথ্য আবিষ্কার করার থাকে, তা হলে সেটা উনিই করেন ; আমরা বাইরের লোক এসে তাঁর এলাকায় মাতব্বরি করে যেন বৈজ্ঞানিক জগতের বাহবাটা না নিই। বৈজ্ঞানিকদের পরস্পরের মধ্যে এই রেশারেশির ভাবটা যে অস্বাভাবিক না সেটা আমি জানি। তবু বলব যে সুদূর বোলিভিয়ায় এসে এ জিনিসটার সামনে পড়তে হবে সেটা আশা করিনি।

* * *

পেদ্রোকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে যখন আমরা গুহার ভিতরে ঢুকলাম তখন প্রায় সাড়ে দশটা। আজ সূর্য কিছুটা ম্লান, কারণ আকাশ পাতলা মেঘে ঢাকা। গতকাল গুহার ভিতরে অনেকদূর পর্যন্ত বাইরের সূর্যের প্রতিফলিত আলোতেই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল ; আজ পঞ্চাশ পা এগোতে না এগোতেই হাতের টর্চ জ্বালতে হল।

পথ যেখানে সরু হয়ে এসেছে, সেখান থেকে যথারীতি হামাগুড়ি দিতে শুরু করলাম। আজ আরও কিছু বেশি দূর যাব। এখানে ছবি নেই, তাই আশেপাশে দেখবারও কিছু নেই। আমরা মাটির দিকে চোখ রেখে এগোতে লাগলাম। পাথর আশ্চর্যরকম মসৃণ, আর আলগা পাথর নেই বললেই চলে। বেশ বোঝা যায় যে এখানে আদিম মানুষেরা অনেক দিন ধরে বসবাস করেছিল, আর তাদের যাতায়াতের ফলেই পাথরের এই মসৃণতা।

গতকাল যে পর্যন্ত এসেছিলাম, তার থেকে শ'খানেক হাত এগিয়ে দেখলাম সুড়ঙ্গ আবার চওড়া হতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আর কোনও ছবির চিহ্ন নেই। ডাম্‌বার্টন বলল, 'জানো শ্যাঙ্কস্—এক একবার মনে হচ্ছে যে আর এগিয়ে লাভ নেই। কিন্তু গুহার এই যে অস্বাভাবিক পরিষ্কার ভাব, এতেই যেন মনে হয় ভিতরে আরও দেখবার জিনিস আছে।'

ডাম্‌বার্টন আমার মনের কথাটাই যেন প্রকাশ করল। সত্যি, কী আশ্চর্য ঝকঝকে তকতকে এই গুহার ভিতরটা। দেয়ালের দিকে চাইলে মনে হয় যেন এখানে নিয়মিত ডাস্টার দিয়ে পরিষ্কার করা হয়।

সুড়ঙ্গ চওড়া হয়ে যাওয়াতে আমরা সোজা হয়ে হাঁটছিলাম, এমন সময় আমার কানে একটা শব্দ এল। ডাম্‌বার্টনের কাঁধে হাত দিয়ে ওকে থামতে বললাম।

'শুনতে পাচ্ছ ?'

খুট খুট খুট খুট খুট খুট...আমার কানে শব্দটা স্পষ্ট—কিন্তু ডাম্‌বার্টনের শ্রবণশক্তি বোধ হয় আমার মতো তীক্ষ্ণ নয়। সে আরও কিছু এগিয়ে গেল। তারপর থেমে ফিসফিস করে বলল, 'পেয়েছি।'

দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ শব্দটা শুনলাম। মাঝে মাঝে থামছে, তবে বেশিক্ষণের জন্য নয়।

মানুষ ? না অন্য কিছু ? বললাম, 'এগিয়ে চলো।'

ডাম্‌বার্টন বলল, 'তোমার পিস্তল সঙ্গে আছে ?'

'আছে।'

'ওটা কাজ করে তো ?'

হেসে বললাম, 'তোমার ওপর তো আর পরীক্ষা করে দেখতে পারি না, তবে এটুকু বলতে পারি যে, আমার তৈরি কোনও জিনিস আজ পর্যন্ত 'ফেল' করেনি।'

'তবে চলো।'

আরও কিছুদূর এগিয়ে একটা মোড় ঘুরেই দুজনে একসঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

আমরা একটা রীতিমতো বড় হল ঘরের মধ্যে এসে পড়েছি। এদিকে ওদিকে টর্চের আলো ফেলে বুঝতে পারলাম সেটা একটা গোল ঘর, যার ডায়ামিটার হবে কম পক্ষে একশো ফুট, আর যেটা উঁচুতে অন্তত কুড়ি ফুট।

হলঘরের দেওয়াল ও ছাত ছবি ও নকশাতে গিজগিজ করছে। ছবির চেয়ে নকশাই বেশি, আর তাদের চেহারা দেখে বুঝতে কোনওই অসুবিধে হল না যে সেগুলো অঙ্ক বা ফরমুলা জাতীয় কিছু।

ডাম্‌বার্টন চাপা গলায় বলল, 'শিল্পের জগৎ থেকে ক্রমে যে বিজ্ঞানের জগতে এসে পড়েছি বলে মনে হচ্ছে! এ কাদের কীর্তি ? এসবের মানে কী ? কবেকার করা এসব

www.BDeBooks.Com

নকশা ?'

খুট খুট শব্দটা থেমে গেছে।

আমি হাত থেকে টর্চটা নামিয়ে রেখে কাঁধের থলি থেকে ক্যামেরা বার করলাম। ফ্ল্যাশলাইট আছে—কোনও চিন্তা নেই। বেশ বুঝতে পারলাম উত্তেজনায় আমার হাত কাঁপছে।

ক্যামেরা বার করে সবেমাত্র দুটো ছবি তুলেছি, এমন সময় একটা ক্ষীণ অথচ তীব্র চিৎকার আমাদের কানে এল।

আওয়াজটা নিঃসন্দেহে আসছে গুহার বাইরে থেকে। পেদ্রোর চিৎকার।

আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে আমরা দুজনেই উলটোদিকে রওনা দিলাম। হেঁটে, দৌড়ে, হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে পৌঁছোতে লাগল প্রায় কুড়ি মিনিট।

বেরিয়ে এসে দেখি পেদ্রো তার জায়গায় নেই, যদিও আমাদের জিনিসপত্রগুলো ঠিকই রয়েছে। কোথায় গেল লোকটা ? ডাইনে একটা পাথরের ঢিপি। ডাম্‌বার্টন দৌড়ে তার পিছন দিকটায় গিয়েই একটা চিৎকার দিল—

'কাম হিয়ার, শ্যাঙ্কস্ !'

গিয়ে দেখি পেদ্রো চিত হয়ে চোখ কপালে তুলে পড়ে আছে, তার গলায় একটা গভীর ক্ষত থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে, আর তার বন্দুকটা পড়ে আছে তার থেকে চার-পাঁচ হাতে দূরে, মাটিতে। পেদ্রোর নিষ্পলক চোখে আতঙ্কের ভাব আমি কোনও দিন ভুলব না। ডাম্‌বার্টন তার নাড়ি ধরে বলল, 'হি ইজ ডেড।'

এটা বলবারও দরকার ছিল না। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে পেদ্রোর দেহে প্রাণ নেই।

পেদ্রোর দিক থেকে এবার দৃষ্টি গেল আরও প্রায় বিশ হাত উত্তর দিকে। মাটিতে খানিকটা জায়গা জুড়ে আরেকটা লালের ছোপ। এগিয়ে গিয়ে বুঝলাম সেটাও হয়তো রক্ত, কিন্তু মানুষের নয়। রক্তের কাছাকাছি যে জিনিসটা পড়ে আছে সেটাকে দেখলে হঠাৎ একটা হাতল-ছাড়া তলোয়ার মনে হয়। হাতে তুলে নিয়ে দেখি সেটা ধাতুর তৈরি কোনও জিনিস নয়।

ডাম্‌বার্টনের হাতে দেওয়াতে সে নেড়ে চেড়ে বলল, 'এ থেকে যা অনুমান করছি সেটা যদি সত্যি হয় তা হলে আর আমাদের এখানে থাকা উচিত নয় !'

আমি বুঝলাম যে আমাদের দুজনেরই অনুমান এক, কিন্তু তাও সেটা সত্যি হতে পারে বলে বিশ্বাস করছিলাম না। বললাম, 'দেওয়ালে আঁকা সেই নাম-না-জানা জানোয়ারের কথা ভাবছ কি ?'

'এগ্‌জ্যাক্টলি। পেদ্রো জখম হয়েও গুলি চালিয়েছিল। তার ফলে জানোয়ারটাও জখম হয়, এবং তার পিঠ থেকে এই কাঁটাটি খসে পড়ে।'

ডাম্‌বার্টনের বয়স পঞ্চাশের উপর হলেও সে রীতিমতো জোয়ান। সে একাই পেদ্রোর মৃতদেহ কাঁধে করে তুলে নিল। আমি বাকি জিনিসপত্র নিলাম।

আকাশে মেঘ করে একটা থমথমে ভাব।

কর্ডোবা তা হলে হয়তো মিথ্যে বলেনি। উত্তরের এই জঙ্গলের মধ্যে আরও কত অজানা বিভীষিকা লুকিয়ে রয়েছে কে জানে ?

পেদ্রোর মৃতদেহ তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে, তার বৃদ্ধ বাবাকে সান্ত্বনা ও কিছু টাকাকড়ি দিয়ে হোটেলে যখন ফিরছি তখন টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। ঘড়িতে তখন

বেজেছে সাতটা।

হোটেলে ঢুকে দেখি সামনেই একটা সোফায় বসে রয়েছেন প্রোফেসর কর্ডোবা। আমাদের দেখেই ভদ্রলোক বেশ ব্যস্তভাবে উঠে এগিয়ে এলেন।

'যাক, তোমরা তা হলে ফিরেছ!'

ডাম্‌বার্টন বলল, 'ফিরেছি, তবে সকলে না।'

'তার মানে?'

www.BDeBooks.Com

কর্ডোবাকে ঘটনাটা বললাম।

সব শুনেটুনে কর্ডোবার চোখে মুখে একটা অদ্ভুত ভাব জেগে উঠল যার মধ্যে আক্ষেপের চেয়ে উল্লাসের মাত্রা অনেক বেশি। চাপা উত্তেজনার সঙ্গে সে বলল, 'আমার কথা বোধ হয় তোমরা বিশ্বাস করনি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছ তো ? আমি জানি ও জঙ্গলে সব অদ্ভুত জানোয়ার রয়েছে, যা পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। আর আমি জানি গুহার ছবি সম্পর্কে তোমাদের ধারণা ভুল। ওখানে ইন্‌কা জাতীয় কোনও সভ্য লোক বাস করত, আর সেও খুব বেশি দিন আগে নয়। ছবির জানোয়ারগুলো দেখেই তো তোমরা গুহার বয়স অনুমান করছিলে ? কিন্তু এখন বুঝতেই পারছ, ওর মধ্যে অন্তত এক ধরনের জানোয়ার এখনও আছে, লোপ পেয়ে যায়নি। কাজেই আমার অনুমান ঠিক। তোমাদের ভালর জন্যই বলছি, এ গুহায় তোমরা আর বৃথা সময় নষ্ট কোরো না।'

কর্ডোবা কথাগুলো বলে হন হন করে হোটেল থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

ডাম্‌বার্টন বলল, 'ভয় করছে, ও নিজে একা বাহাদুরি নেবার জন্য ফস্ করে না খবরের কাগজে কিছু বারটার করে বসে। এখনও কিছুই পরিষ্কারভাবে জানা যায়নি, অথচ ও আমাদের টেক্কা দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।'

আমি বললাম, 'তাও তো জানে না যে গুহার ভিতরে আমরা খুট্ খুট্ শব্দ শুনেছি। তা হলে তো ও বলে বসত যে এখনও গুহার মধ্যে লোক বাস করছে—ছবিগুলো পঞ্চাশ হাজার নয়, পাঁচ বছর আগে আঁকা।'

আমরা রীতিমতো ক্লান্ত বোধ করছিলাম—তাই আর সময় নষ্ট না করে যে যার ঘরে চলে গেলাম। বৃষ্টিটা বেশ জোরেই নেমেছে, তার সঙ্গে মাঝে মাঝে মেঘের গর্জন আর বিদ্যুতের চমক। গরম জলে স্নান করে, পর পর দু কাপ কফি (এখানকার কফি ভারী চমৎকার) খেয়ে ক্রমে শরীর ও মনের জোর ফিরে এল। ডিনারও ঘরেই আনিয়ে খেলাম। তারপর বসলাম আমার তোলা ছবিগুলো নিয়ে। উদ্দেশ্য হিজিবিজিগুলোর রহস্য উদ্‌ঘাটন করা। অপরিচিত অক্ষরের মানে বার করতে আমার জুড়ি কমই আছে। হারাপ্পা আর মহেঞ্জোদারোর লেখার মানে পৃথিবীতে আমিই প্রথম বার করি।

দেড় ঘণ্টা ধরে হিজিবিজিগুলো পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে একটা জিনিস আবিষ্কার করলাম, যেটা তৎক্ষণাৎ ডাম্‌বার্টনকে ফোন করে জানালাম। চিহ্নগুলো সবই বৈজ্ঞানিক ফরমুলা, আর তার সঙ্গে আমাদের আধুনিক যুগের অনেক ফরমুলার মিল আছে।

ডাম্‌বার্টন পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার ঘরে এসে আমার কথা শুনে ধপ করে খাটের উপর বসে পড়ে বলল, 'দিস ইজ টু মাচ। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে শ্যাঙ্কস্। এ ফরমুলা পঞ্চাশ হাজার বছর আগের বনমানুষে বার করেছে, এটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না।'

আমি বললাম, 'তা হলে ?'

'তা হলে আর কী ! তা হলে ইতিহাস আবার নতুন করে লিখতে হয়। আদিম মানুষ সম্বন্ধে আজ অবধি যা কিছু জানা গেছে, তার কোনওটাই এই অঙ্কের ব্যাপারের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় না।'

পেদ্রোর মৃতদেহের কাছেই যে কাঁটার মতো জিনিসটা পাওয়া গিয়েছিল সেটা আমার ঘরে নিয়ে এসেছিলাম। ডাম্‌বার্টন অন্যমনস্কভাবে সেটা হাতে তুলে নিয়েছিল। হঠাৎ ও সেটা নাকের সামনে ধরে তার গন্ধ শুঁকতে লাগল।

'শ্যাঙ্কস্ !'

ডাম্‌বার্টনের চোখ জ্বলজ্বল করছে।

'শুঁকে দেখো।'

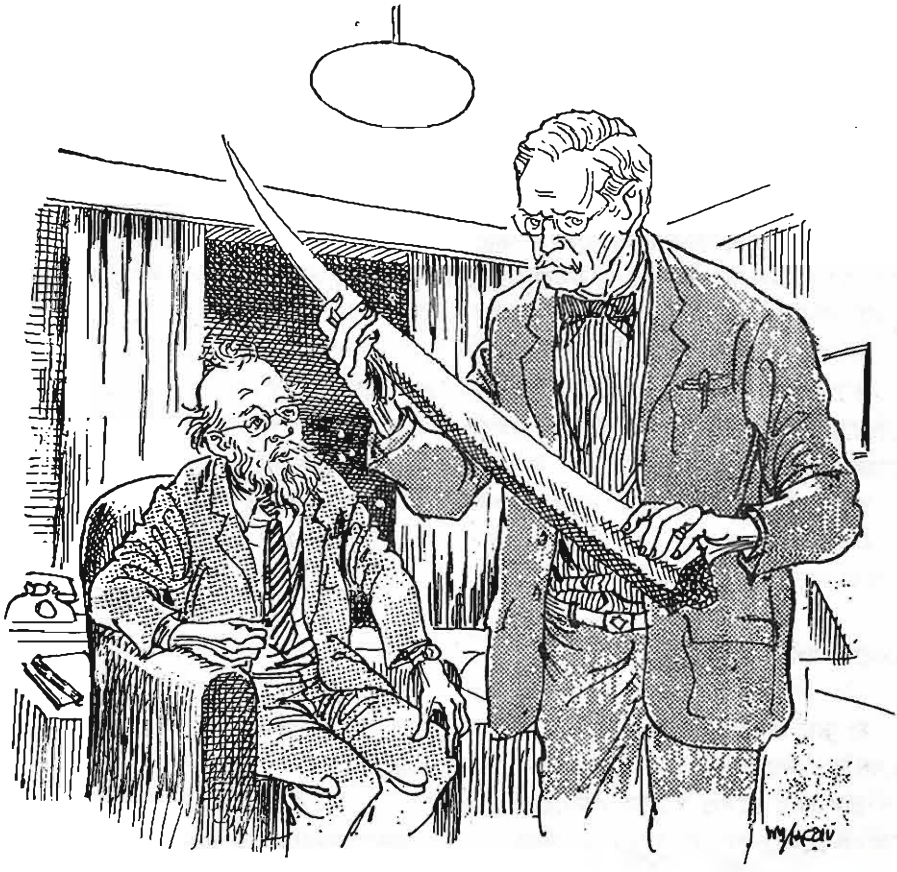

আমি কাঁটাটা হাতে নিয়ে নাকে লাগাতেই একটা চেনা চেনা গন্ধ পেলাম। বললাম, 'প্লাস্টিক।'

ঠিক! কোনও সন্দেহ নেই। খুব চতুর কারিগরি—কিন্তু এটা মানুষের হাতেই তৈরি। এটার সঙ্গে কোনও জানোয়ারের কোনও সম্পর্ক নেই।

'কিন্তু এর মানে কী?'

প্রশ্নটা করা মাত্রই এর অনেকগুলো উত্তর একঝলকে আমার মনের মধ্যে খেলে গেল। বললাম, 'ব্যাপার গুরুতর। প্রথম—পেদ্রো কোনও জানোয়ারের ভয়ে মরেনি। তাকে মানুষ মেরেছে। খুন করেছে। তার মানে একটাই হতে পারে—যে খুন করেছে সে চাইছে না যে আমরা গুহার কাছে যাই। আততায়ী যে কে, সেটা বোধ হয় স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।'

'হুঁ!'

ডাম্‌বার্টন খাট থেকে উঠে পায়চারি শুরু করল। তারপর বলল, 'আমাদের এখানে টিকতে দেবে মনে হয় না।'

'কিন্তু এইভাবে হার মানব?' আমার বৈজ্ঞানিক মনে বিদ্রোহের ভাব জেগে উঠেছিল।

ডাম্‌বার্টন বলল, 'একটা কাজ করা যায়।'

'কী?'

www.BDeBooks.Com

'কর্ডোবাকে বলি, ক্রেডিট নেবার ব্যাপারে আমাদের কোনও লোভ নেই। আসলে যেটা দরকার, সেটা হল এই আশ্চর্য গুহার তথ্যগুলো পৃথিবীর লোককে নির্ভুলভাবে জানানো। সুতরাং কর্ডোবা আমাদের সঙ্গে আসুক। আমরা একসঙ্গে অভিযান চালাই। তার অনুমান যদি ভুল হয়, তবু তার নামটা আমাদের সঙ্গেই জড়ানো থাকবে। লোকের চোখে আমরা হব একটা 'টিম'। কী মনে হয় ?'

'কিন্তু খুনিকে এইভাবে দলে টানবে ?'

'খুনের প্রমাণ তো নেই। অথচ এটা না করলে সে আমাদের কাজে নানান্ বাধার সৃষ্টি করবে। আমাদের কাজ শেষ হোক। তারপর ওর মুখোশ খুলে দেওয়া যাবে। এখন কিছু বলব না। এমনকী, আমরা যে বুঝতে পেরেছি কাঁটাটা প্লাস্টিকের, সেটাও বলব না। ওকে বুঝতে দেব আমরা ওর বন্ধু।'

'বেশ তাই ভাল।'

কর্ডোবাকে ফোন করে পাওয়া গেল না। এমনকী, তার বাড়ির লোকেও জানে না সে কোথায় গেছে। ঠিক করলাম কাল সকালে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করব। আমাদের এসব কাজ যাতে ব্যর্থ না হয় তার জন্য যা কিছু করার দরকার করতে হবে।

ভয় হচ্ছে আকাশের অবস্থা দেখে। কালও যদি এমন থাকে তা হলে আর বেরোনো হবে না। তবে ছবি রয়েছে প্রায় আড়াইশো। সেগুলো ভাল করে দেখেই সারাদিন কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

২০শে আগস্ট

যা ভয় পেয়েছিলাম তাই হল। আজ সারাদিন হোটেলের ঘরে বসেই কাটাতে হল। এখন রাত সাড়ে দশটা। এতক্ষণে বৃষ্টি একটু ধরেছে।

তবে ঘরে বসেও ঘটনার কোনও অভাব ঘটেনি। প্রথমত, আজও সারাদিন কর্ডোবার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি অনেকবার টেলিফোন করা হয়েছে। ওর বাড়ির লোক দেখলাম বেশ চিন্তিত। পাগলামোর বশে বেরিয়ে গিয়ে ভূমিকম্পের ফলে রাস্তায় যে সব ফাটল হয়েছে, তার একটায় হয়তো পড়েটড়ে গেছে—এই তাদের আশঙ্কা।

এদিকে ডাম্‌বার্টনের মাথায় আরেকটা আশ্চর্য ধারণা জন্মেছে। দুপুরবেলা হন্তদন্ত হয়ে আমার ঘরে এসে বলল, 'সর্বনাশ !'

আমি বললাম, 'আবার কী হল ?'

ডাম্‌বার্টন সোফাতে বসে বলল, 'এটা তোমার মাথায় ঢুকেছে কি যে, দেয়ালের ওই সব সাংকেতিক ফরমুলাগুলো সব আসলে কর্ডোবার লেখা ? ধরো যদি ছবির পাশে ওই হিজিবিজিগুলো লিখে সে প্রমাণ করতে চায় যে গুহাবাসী লোকেরা বিজ্ঞানে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিল ? এমন একটা জিনিস যদি সে প্রমাণ করতে পারে, তা হলে তার খ্যাতিটা কেমন হবে তা বুঝতে পারছ ?'

'সাবাস বলেছ !'

সত্যিই, ডাম্‌বার্টনের চিন্তাশক্তির তারিফ না করে পারলাম না। ডাম্‌বার্টন বলে চলল, 'কী শয়তানি বুদ্ধি লোকটার ভাবতে পার ? আমি এখানে এসে পৌঁছোবার প্রায় দশদিন আগে গুহাটা আবিষ্কার হয়েছিল। কর্ডোবা অনেক সময় পেয়েছে গুহাকে নিজের মতো করে সাজানোর জন্য। এইসব পাথরের যন্ত্রপাতি ও-ই তৈরি করিয়েছে—যেমন প্লাস্টিকের কাঁটাটা

করিয়েছে।'

আমি বললাম, 'ফরমুলাগুলোর পিছনে বোধ হয় মিথ্যাই সময় নষ্ট করলাম। কিন্তু—' আমার মনে হঠাৎ একটা খটকা লাগল—'গুহার ভিতরে খুট খুট শব্দটা কোত্থেকে আসছিল ?'

'সেটাও যে কর্ডোবা নয় তা কী করে জানলে ? ও যদি পেদ্রোকে খুন করে থাকে, তা হলে ও সেদিন গুহার আশেপাশেই ছিল। হয়তো গুহার আরেকটা মুখ আবিষ্কার করেছে। সেটা দিয়ে ঢুকে আমাদের ভয়টয় দেখানোর জন্য শব্দটা করছিল।'

'কিন্তু এই সব করে ও অন্তত আমাকে হটাতে পারবে না।'

ডাম্‌বার্টন বলল, 'আমাকেও না। কাল যদি বৃষ্টি থামে তা হলে আমরা আবার যাব।'

'আলবৎ ! আমার অ্যানিস্থিয়াম বন্দুকের কথা তো আর ও জানে না।'

ডাম্‌বার্টন চলে গেলে পর বসে বসে ভাবতে লাগলাম। কর্ডোবা যদি সত্যিই এতসব কাণ্ড করে থাকে, তা হলে বলতে হয় ওর মতো কূটবুদ্ধি শয়তান বৈজ্ঞানিক আর নেই। সত্যি বলতে কী, ওকে বৈজ্ঞানিক বলতে আর আমার ইচ্ছে করছে না।

কাল যদি গুহার আরও ভিতরে গিয়ে আর নতুন কিছু পাওয়া না যায়, তা হলে আর এখানে থেকে লাভ নেই। আমি দেশে ফিরে যাব। গিরিডিতে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। আর আমার বেড়াল নিউটনের জন্যেও মন কেমন করছে।

২২শে আগস্ট

মানুষের মনের ভাণ্ডারে যে কত কোটি কোটি স্মৃতি জমে থাকে, তার হিসাব কেউ কোনওদিন করতে পারেনি। আর কীভাবে ব্রেনের ঠিক কোনখানে সেগুলো জমা থাকে, তাও কেউ জানে না। শুধু এইটুকুই আমরা জানি যে, যেমনি বহুকালের পুরনো কথাও হঠাৎ হঠাৎ কারণে অকারণে আমাদের মনে পড়ে যায়, তেমনি আবার কোনও কোনও ঘটনা একেবারে চিরকালের মতো মন থেকে মুছে যায়। কিন্তু এক একটা ঘটনা থাকে যেগুলো কোনওদিনও ভোলা যায় না। একটু চুপ করে বসে থাকলেই দশ বছর পরেও এসব ঘটনা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তার উপর সে ঘটনা যদি কালকের মতো সাংঘাতিক হয়, তা হলে সেটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরে একটা শিহরন অনুভব করা যায়। আমি যে এখনও বেঁচে আছি সেটাই আশ্চর্য, আর কোন অদৃশ্য শক্তি যে আমাকে বার বার এভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায় তাও জানি না।

কাল ডায়রি লেখা হয়নি, তাই সকাল থেকেই শুরু করি।

বৃষ্টি পরশু মাঝরাত থেকেই থেমে গিয়েছিল। আমাদের জিপ তৈরি ছিল ঠিক সময়ে। আমি আর ডাম্‌বার্টন ভোর ছটায় হোটেল থেকে বেরোই। আমাদের জিপের ড্রাইভারের নাম মিগুয়েল, সেও জাতে স্প্যানিশ। গাড়ি রওনা হবার কিছু পরেই মিগুয়েল বলল, কর্ডোবার নাকি এখনও পর্যন্ত কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। শুধু এইটুকু জানা গেছে যে সে হেঁটে বেরোয়নি, জিপ নিয়ে বেরিয়েছে। আমরা প্রমাদ গুনলাম। তা হলে কি আবার সে গুহার দিকেই গেছে নাকি ? গতকালই গেছে ? এই বৃষ্টির মধ্যে ?

সাড়ে তিন ঘণ্টা পর আমাদের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। কর্ডোবার জিপ পাহাড়ের ফাটলের সামনে গুহার রাস্তার মুখটাতেই দাঁড়িয়ে আছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে জিপটার উপর দিয়ে প্রচুর ঝড়ঝাপটা গেছে। ড্রাইভার বোধ হয় কর্ডোবার সঙ্গেই গেছে, কারণ গাড়ি খালি পড়ে আছে।

আমরা আর অপেক্ষা না করে রওনা দিলাম। মিগুয়েল বলল, 'সিনিওর, আপনারা

www.BDeBooks.Com

যাবেন, এটা আমার একদম ভাল লাগছে না। আমি যেতাম আপনাদের সঙ্গে, কিন্তু সেদিন পেদ্রোর যা হল, তারপরে মনে বড় ভয় ঢুকেছে। আমার বাড়িতে বউ ছেলে রয়েছে।'

আমরা দুজনেই বললাম, 'তোমার কোনও প্রয়োজন নেই ; কোনও ভয়ও নেই। যদি বিপদের আশঙ্কা দেখ, তা হলে আমাদের জন্য অপেক্ষা না করে চলে যেও। তবে বিপদ কিছু হবে বলে মনে হয় না। আর দুষ্টু লোককে শায়েস্তা করার অস্ত্র আমাদের কাছে আছে।'

গুহার মুখে পৌঁছে চারদিকে জনমানবের কোনও চিহ্ন দেখতে পেলাম না। অন্যদিনের মতোই সব নিঝুম, নিস্তব্ধ। জমিটা পাথুরে, আর জঙ্গলের দিকে ঢালু হয়ে গেছে বলে রাত্রের বৃষ্টির জল দাঁড়ায়নি এখানে। বৃষ্টি যে হয়েছে সেটা প্রায় বোঝাই যায় না।

কর্ডোবা কি তা হলে গুহার ভিতরেই রয়েছে, না জঙ্গলের দিকে গেছে ?

ডাম্‌বার্টন বলল, 'বাইরে অপেক্ষা করে কি কিছু লাভ আছে ?'

আমি 'না' বলে গুহার দিকে কয়েক পা এগোতেই, গুহার মুখের ডান পাশে বাইরের পাথরের গায়ে একটা ফাটলের ভিতর একটা সাদা জিনিস দেখতে পেলাম। এগিয়ে হাত ঢুকিয়ে দেখি সেটা একটা ভাঁজ করা চিঠি—কর্ডোবার লেখা। ভাঁজ খুলে দুজনে একসঙ্গে সেটা পড়লাম। তাতে লেখা আছে—

প্রিয় প্রোফেসর ডাম্‌বার্টন ও প্রোফেসর শঙ্কু,

তোমরা আবার এখানে আসবে তা জানি। এ চিঠি তোমাদের হাতে পড়ামাত্রই বুঝবে আমার কোনও বিপদ হয়েছে, আমি গুহায় আটকা পড়েছি। সুতরাং তোমরা ঢোকার আগে কাজটা ঠিক করছ কি না সেটা একটু ভেবে নিও। আমি মরলেও, গুহার রহস্য ভেদ করেই মরব, কিন্তু লোকের কাছে সে রহস্যর সন্ধান দিতে পারব না। তোমরা যদি বেঁচে থাক, তা হলে এই গুহার কথা তোমরা প্রকাশ করতে পারবে। আমার একান্ত অনুরোধ যে তোমাদের সঙ্গে যেন আমার নামটাও জড়িয়ে থাকে।

পেদ্রোর মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী সেটা হয়তো বুঝতে পেরেছ। কাঁটাটা আমারই ল্যাবরেটরিতে তৈরি। তবে জঙ্গলে পায়ের দাগ আমি সত্যিই দেখেছিলাম, সুতরাং ও ব্যাপারে তোমরা নিশ্চিন্ত হলে সাংঘাতিক ভুল করবে।

জানি, ঈশ্বর তোমাদের রক্ষা করবেন। তোমরা তো আর আমার মতো পাপী নও। ইতি—

পোরফিরিও কর্ডোবা

এই একটি চিঠিতে আমাদের মনের ভাব একেবারে বদলে গেল, আর নতুন করে একটা অজানা আশঙ্কায় মনটা ভরে গেল। কিন্তু কাজ বন্ধ করলে চলবে না। বললাম, 'চলো হিউগো, ভিতরে যাই। যা থাকে কপালে !'

কিছুদূর গিয়েই বুঝতে পারলাম এখানে কর্ডোবা এসেছিল, কারণ মাটিতে পড়ে আছে একটা আধখাওয়া কালো রঙের সিগারেট, যেমন সিগারেট একমাত্র কর্ডোবাকেই খেতে দেখেছি। কিন্তু এ ছাড়া মানুষের আর কোনও চিহ্ন চোখে পড়ল না। পাথরের উপর যখন পায়ের ছাপ পড়ে না, তখন আর কী চিহ্নই বা থাকবে ?

সেই বিরাট হলঘরের ভিতর এসে, এবারে আর না থেমে সোজা বিপরীত দিকের সুড়ঙ্গ ধরে চলতে লাগলাম। সুড়ঙ্গ হলেও, এখানে রাস্তা বেশ চওড়া, মাথা হেঁট করে হাঁটতে হয় না।

একটা আওয়াজ কানে আসছে। একটা মৃদু গর্জনের মতো শব্দ। ডাম্‌বার্টনও শুনল

সেটা। গর্জনের মধ্যে বাড়া কমার ব্যাপারও লক্ষ করলাম। আসল আওয়াজটা কত জোরে, বা সেটা কতদূর থেকে আসছে, তা বোঝার কোনও উপায় নেই। ডাম্‌বার্টন বলল, 'গুহার ভিতর জানোয়ার টানোয়ার নেই তো?' সত্যিই আওয়াজটা ভারী অদ্ভুত—একবার উঠছে, একবার পড়ছে—অনেকটা গোঙানির মতো।

সামনে সুড়ঙ্গটা ডানদিকে বেঁকে গেছে। মোড়টা পেরোতেই দেখলাম আরেকটা বড় ঘরে এসে পড়েছি। টর্চের আলো এদিক ওদিক ফেলে বুঝলাম এ এক বিচিত্র ঘর, চারিদিকে অদ্ভুত অজানা যন্ত্রপাতি দিয়ে ঠাসা, আর দেওয়ালে ছবির বদলে কেবল অঙ্ক আর জ্যামিতিক নকশা আঁকা। যন্ত্রপাতিগুলোর কোনওটাই কাচ বা লোহা বা ইস্পাত বা আমাদের চেনা কোনও ধাতু দিয়ে তৈরি নয়। এছাড়া রয়েছে সরু সরু লম্বা লম্বা তারের মতো জিনিস, যেগুলো দেওয়ালের গা বেয়ে উঠে এদিক ওদিক গেছে। সেগুলোও যে কীসের তৈরি সেটাও দেখে বোঝা গেল না।

মেঝেতে কিছু আছে কি না দেখবার জন্য টর্চের আলোটা নীচের দিকে নামাতেই একটা দৃশ্য দেখে আমার রক্ত জল হয়ে গেল।

দেওয়ালের কাছেই, তাঁর ডান হাত দিয়ে একটা তার আঁকড়ে ধরে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন প্রোফেসর কর্ডোবা। কর্ডোবার পিঠে মাথা রেখে চিত হয়ে মুখ হাঁ করে পড়ে আছে তাঁর জিপের ড্রাইভার, আর ড্রাইভারের পায়ের কাছে ডান হাতে একটি বন্দুক আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে আরেকটি অচেনা লোক। তিনজনের কারুরই দেহে যে প্রাণ নেই সে কথা আর বলে দিতে হয় না!

আমার মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে এল—'ইলেক্‌ট্রিক্ শক্!' তারপর বললাম, 'ওদের ছুঁয়ো না, ডাম্‌বার্টন।'

ডাম্‌বার্টন চাপা গলায় বলল, 'সেটা বলাই বাহুল্য, তবে তাও ধন্যবাদ। আর ধন্যবাদ কর্ডোবাকে, কারণ ওর দশা না দেখলে আমরাও হয়তো ওই তারে হাত দিয়ে ফেলতে পারতাম। কর্ডোবাকে বাঁচাতে গিয়েই অন্য দুজনেও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়েছে। কী সাংঘাতিক ব্যাপার বলো তো!'

আমি বললাম, 'এ থেকে একটা জিনিস প্রমাণ হচ্ছে—ফরমুলাগুলো কর্ডোবার লেখা নয়।'

সেই মৃদু গর্জনটা এখন আর মৃদু নয়। সেটা আসছে আমাদের বেশ কাছ থেকেই। আমি টর্চ হাতে এগিয়ে গেলাম, আমার পিছনে ডাম্‌বার্টন। গর্জনটা বেড়ে চলেছে।

যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বাঁচিয়ে অতি সাবধানে মিনিটখানেক হাঁটার পর সামনে আরেকটা দরজা দেখতে পেলাম। এবং বুঝলাম যে সে দরজার পিছনে আরেকটি ঘর, এবং সে ঘরে একটি আলো রয়েছে। ডাম্‌বার্টনকে বললাম, 'তোমার টর্চটা নেভাও তো।'

দুজনের আলো নেভাতেই একটা মৃদু লাল কম্পমান আলোয় গুহার ভিতরটা ভরে গেল। বুঝলাম ঘরটায় আগুন জ্বলছে, এবং গর্জনটাও ওই ঘর থেকেই আসছে। ডাম্‌বার্টনের গলা পেলাম—

'তোমার বন্দুকটা তৈরি রাখো।'

বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে অতি সন্তর্পণে আমরা দুজনে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম। প্রকাণ্ড ঘর। তার এক কোণে একটা চুল্লিতে আগুন জ্বলছে, তার সামনে কিছু জন্তুর হাড় পড়ে আছে। ঘরের মাঝখানে একটা পাথরের বেদি বা খাট, তাতে চিত হয়ে শুয়ে আছে একটি প্রাণী, ঘুমন্ত। গর্জনটা আসছে তার নাক থেকে।

আমরা নিঃশব্দে এক পা এক পা করে খাটের দিকে এগিয়ে গেলাম।

www.BDeBooks.Com

প্রাণীটিকে মানুষ বলতে বাধে। তার কপাল ঢালু, মাথার চুল নেমে এসেছে প্রায় ভুরু অবধি। তার ঠোঁট দুটো পুরু, থুতনি চাপা, কান দুটো চ্যাপটা আর ঘাড় নেই বললেই চলে। তার সর্বাঙ্গ ছাই রঙের লোমে ঢাকা। আর মুখের যেখানে লোম নেই, সেখানের চামড়া অবিশ্বাস্য রকম কুঁচকোনো। তার বাঁ হাতটা বুকের উপর আর অন্যটা খাটের উপর লম্বা করে রাখা। হাত এত লম্বা যে আঙুলের ডগা গিয়ে পৌঁছেছে হাঁটু অবধি।

ডাম্‌বার্টন অস্ফুটস্বরে বলল, 'কেভম্যান! এখনও বাঁদরের অবস্থা থেকে পুরোপুরি মানুষে পৌঁছোয়নি।'

গলার স্বর যথাসম্ভব নিচু করে আমি জবাব দিলাম, 'কেভম্যান শুধু চেহারাতেই, কারণ আমার বিশ্বাস গুহার মধ্যে যা কিছু দেখছি সবই এরই কীর্তি।'

ডাম্‌বার্টন হঠাৎ কাঁধে হাত দিয়ে বলল, 'শ্যাঙ্কস্—ওটা কী লেখা আছে পড়তে পারছ?'

ডাম্‌বার্টন দেয়ালের একটা অংশে আঙুল দেখাল। বড় বড় অক্ষরে কী যেন লেখা রয়েছে। অক্ষরগুলো ফরমুলা থেকেই চিনে নিয়েছিলাম, সুতরাং লেখার মানে বার করতে সময় লাগল না। বললাম, 'আশ্চর্য!'

'কী?'

'লিখছে—'আর সবাই মরে গেছে। আমি আছি। আমি থাকব। আমি একা। আমি অনেক জানি। আরও জানব। জানার শেষ নেই। পাথর আমার বন্ধু। পাথর শত্রু।'

ডাম্‌বার্টন বলল, 'তা হলে বুঝতে পারছ—এই সেই প্রাগৈতিহাসিক মানুষেরই একজন—কোনও আশ্চর্য উপায়ে অফুরন্ত আয়ু পেয়ে গেছে।'

'হুঁ—আর হাজার হাজার বছর ধরে জ্ঞান সঞ্চয় করে চলেছে। কেবল চেহারাটা রয়ে গেছে সেই গুহাবাসী মানুষেরই মতন। ...কিন্তু শেষের দুটো কথার কী মানে বুঝলে?'

'পাথর যে এর বন্ধু সে তো দেখতেই পাচ্ছি। এর ঘরবাড়ি আসবাবপত্র যন্ত্রপাতি সবই পাথরের তৈরি। কিন্তু শত্রু বলতে কী বুঝছে জানি না।'

আমারই মতো ডাম্‌বার্টনও বিস্ময়ে প্রায় হতবাক হয়ে গিয়েছিল। বলল, 'গুহায় থাকে, তাই দিনরাত্রের তফাত সব সময়ে বুঝতে পারে না। হয়তো রাত্রে জেগে থাকে, তাই দিনে ঘুমোচ্ছে।'

ছবি তোলার সাহস হচ্ছিল না—যদি ক্যামেরার শব্দে ঘুম ভেঙে যায়! আমাদের মতো মানুষকে হঠাৎ চোখের সামনে দেখলে কী করবে ও? কিন্তু লোভটা সামলানোও ভারী কঠিন হয়ে পড়ছিল। তাই ডাম্‌বার্টনের হাতে বন্দুকটা দিয়ে কাঁধের থলি থেকে ক্যামেরাটা বার করব বলে হাত ঢুকিয়েছি, এমন সময় নাক ডাকানোর শব্দ ছাপিয়ে গুরুগম্ভীর ঘড়ঘড়ানির শব্দ পেলাম। ডাম্‌বার্টন খপ করে আমার হাতটা ধরে বলল, 'আর্থকুয়েক!'

পরমুহূর্তেই একটা ভীষণ ঝাঁকুনিতে গুহার ভেতরটা থরথর করে কেঁপে উঠল।

কয়েক মুহূর্তের জন্য কী যে করব কিছু বুঝতে পারলাম না।

গুড়গুড় গুম গুম শব্দটা বেড়ে চলেছে, আর তার সঙ্গে ঝাঁকুনিও।

'বন্দুক!' ডাম্‌বার্টন চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল।

আদিম মানুষটার ঘুম ভেঙে সে খাটের উপর উঠে বসেছে।

আমি ডাম্‌বার্টনের হাত থেকে বন্দুকটা নিয়েও কিছু করতে পারলাম না। কেবল তন্ময় হয়ে সামনের দিকে চেয়ে রইলাম।

লোকটা এখন উঠে দাঁড়িয়ে তার লোমশ ভুরুর তলায় কোটরে ঢোকা চোখদুটো দিয়ে একদৃষ্টে আমাদের দিকে চেয়ে দেখছে। সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ফলে বুঝতে পারলাম সে লম্বায় পাঁচ ফুটের বেশি নয়। তার কাঁধটা গোরিলার মতো চওড়া, আর পিঠটা বয়সের দরুন

বোধ হয় বেঁকে গেছে। তার চাহনি দেখে বুঝলাম সে আমাদের মতো প্রাণী এর আগে কখনও দেখেনি।

ভূমিকম্পের ঘন ঘন ঝাঁকুনির ফলে লোকটা যেন ভয় পেয়েছে। একটা কাতর অথচ কর্কশ আওয়াজ করে সে হাত বাড়িয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

একটা প্রচণ্ড শব্দ পেয়ে বুঝলাম গুহার দেয়ালে কোথায় যেন ফাটল ধরল। আমরা আর অপেক্ষা না করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। পরমুহূর্তেই আদিম মানুষের ঘরের ছাতটা ধ্বসে পড়ে গেল।

কর্ডোবা আর তার সহচরদের মৃতদেহ পাশ কাটিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে ডাম্‌বার্টন বলল, 'শেষ কথাটার মানে বুঝলে তো ? পাথর চাপা পড়েই ওকে মরতে হল।'

www.BDeBooks.Com

ঝাঁকুনি থামছে না। কীভাবে আমরা বাইরে পৌঁছোব জানি না। এখনও হামাগুড়ি দেওয়া বাকি আছে। বড় হলঘরটার কাছাকাছি এসে দেখি সামনে দিনের আলো দেখা যাচ্ছে। কীরকম হল ? পথ তো একটাই। ভুল পথে এসে পড়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই।

এগিয়ে গিয়ে দেখি ভূমিকম্পে ঘরের দেয়ালে বিরাট ফাটল হয়ে বেরোবার একটা নতুন পথ তৈরি হয়ে গিয়েছে।

পাথর ভাঙার ফলে কিছু আশ্চর্য ছবি ও নকশা যে চিরকালের মতো ধ্বংস হয়ে গেল, সেটা আর ভাববার সময় ছিল না। গুহার নতুন মুখ দিয়ে দুজনে দৌড়ে ভাঙা পাথর ডিঙিয়ে বাইরে বেরোলাম।

বাইরে এসে কয়েক সেকেন্ডের জন্য দিক্‌ভ্রম হয়েছিল, তারপর অ্যান্ডিজের চুড়োয় সাদা বরফ দেখে আবার হদিস পেয়ে গেলাম। আমাদের বাঁ দিক ধরে চলতে হবে—তা হলেই গুহার আসল মুখ ও আমাদের বেরোনোর রাস্তায় পৌঁছোতে পারব।

মাঝে প্রায় আধ মিনিটের জন্য ঝাঁকুনি থেমেছিল ; আবার গুম গুম শব্দের সঙ্গে প্রচণ্ডতর ঝাঁকুনি শুরু হল।

কিন্তু ভূমিকম্পের শব্দ ছাড়াও যেন আরেকটা শব্দ পাচ্ছি। সেটা আসছে আমাদের ডানদিকের ওই ভয়ংকর জঙ্গল থেকে। শব্দটা শুনে মনে হয় যেন অসংখ্য দামামা একসঙ্গে বাজছে, আর তার সঙ্গে যেন অজস্র অজানা প্রাণী একসঙ্গে আতঙ্কে চিৎকার করছে।

জঙ্গলের দিকে চেয়ে থেমে পড়েছিলাম, কিন্তু ডাম্‌বার্টন আমার আস্তিন ধরে টান দিয়ে বলল, 'থেমো না ! এগিয়ে চলো !'

পথ খানিকটা সমতল হয়ে এসেছে বলে আমরা আমাদের দৌড়ের মাত্রাটা বাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু ডানদিক থেকে দৃষ্টি সরাতে পারছিলাম না। কারণ সেই ধুপধুপানি আর তার সঙ্গে সেই ভয়াবহ আর্তনাদের শব্দ ক্রমশ বাড়ছিল, এগিয়ে আসছিল।

হঠাৎ দেখতে পেলাম জানোয়ারগুলোকে। জঙ্গল থেকে পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে আসছে। হাজার হাজার জানোয়ার। প্রথম সারিতে ম্যামথ—অতিকায়, লোমশ, প্রাগৈতিহাসিক হাতি। চিৎকার করতে করতে হুড়মুড় করে এগিয়ে আসছে জঙ্গলের বাইরে খোলা জায়গায়—অর্থাৎ আমাদেরই দিকে।

এই অদ্ভুত ভয়াবহ দৃশ্য দেখে আমাদের দুজনেরই যেন আর পা সরল না। অথচ জানোয়ারগুলো এসে পড়েছে তিন-চারশো গজের মধ্যে।

হঠাৎ ডাম্‌বার্টন শুকনো গলায় চিৎকার করে বলে উঠল, 'ওটা কী ?'

আমিও দেখলাম—ম্যামথের ঠিক পিছনেই এক কিম্ভূত জানোয়ার—তার গলা লম্বা, নাকের উপর শিং আর পিঠের উপর কাঁটার ঝাড়। গুহার দেয়ালের ছবির জানোয়ার !—ল্যাজের উপর ভর দিয়ে ক্যাঙারুর মতো লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসছে প্রাণের ভয়ে !

আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। হাতে আমার অ্যানিস্থিয়াম বন্দুক। কিন্তু এই উন্মত্ত পশুসেনার সামনে এ বন্দুক আর কী ?

ডাম্‌বার্টনের পা কাঁপছিল। 'দিস ইজ দি এন্ড'—বলে সে ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল।

আমি এক হ্যাঁচকা টানে ডাম্‌বার্টনকে মাটি থেকে উঠিয়ে বললাম, 'পাগলের মতো কোরো না—এখনও সময় আছে পালানোর।'

মুখে বললেও, চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি ম্যামথের সার একশো গজের মধ্যে এসে পড়েছে।

ভূমিকম্পের তেজ কিছুটা কমেছিল, এখন আবার প্রচণ্ড কাঁপানি শুরু হল, আর তার সঙ্গে

বাড়ল জন্তুদের চিৎকার। পিছনে বাইসনের দল দেখা দিয়েছে। সব মিলিয়ে সে যে কী ভয়ংকর শব্দ তা আমি লিখে বোঝাতে পারব না।

কিছুদূর দৌড়ে আর এগোতে পারলাম না। এ অবস্থায় বাঁচবার আশা পাগলামো ছাড়া আর কিছু না। তার চেয়ে বরং হাতির পায়ের তলায় পিষে যাবার আগে সেগুলোকে কাছ থেকে ভাল করে দেখে নিই। এমন সুযোগও এর আগে কোনও সভ্য মানুষের কখনও হয়নি!

ডাম্‌বার্টন আর আমি দুজনেই থেমে এগিয়ে আসা জানোয়ারের দলের দিকে মুখ করে দাঁড়ালাম। আর কতক্ষণ? খুব বেশি তো বিশ সেকেন্ড।

আবার নতুন করে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি শুরু হল—আর তার সঙ্গে সঙ্গে জানোয়ারদের মধ্যে একটা অদ্ভুত চাঞ্চল্য—যেন তারা হঠাৎ বুঝতে পারছে না কোনদিকে যাবে—দিশেহারা হয়ে এদিক ওদিক করছে—পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে।

এরপর যে দৃশ্য দেখলাম, তেমন দৃশ্য আমি আর কখনও দেখিনি—ভবিষ্যতেও দেখব কি না জানি না। সামনের সারির ম্যামথগুলোর পায়ের তলার জমিটা জঙ্গলের সঙ্গে সমান্তরাল একটা লাইনে প্রায় মাইলখানেক জায়গা জুড়ে চিরে দুভাগ হয়ে গেল। তার ফলে যে বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হল তাতে কমপক্ষে একশো হাতি, বাইসন আর সেই নাম-না-জানা জন্তু হাত পা ছুড়ে বিকট চিৎকার করতে করতে ভূগর্ভে তলিয়ে গেল। আর অন্য জানোয়ারগুলো এবার ছুটতে শুরু করল উলটো দিকে—অর্থাৎ আবার সেই জঙ্গলের দিকে।

আর আমরা? এই প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পই শেষকালে আমাদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করল।

* * * *

গুহার মুখটাতে এসে দেখলাম তার ভিতরে যাবার আর কোনও উপায় নেই। ছাত ধ্বসে মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। ভিতরে যা কিছু ছিল তা বোধ হয় চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। শুধু রয়ে গেল আমার তোলা ছবিগুলো।

ফাটলের বাইরে এসে দেখি মিগুয়েল পালায়নি, তবে ভয়ে প্রায় আধমরা হয়ে গেছে। আমাদের দেখে আনন্দে জড়িয়ে ধরে কাঁদে আর কী!

কোচাবাম্বা ফেরার পথে ডাম্‌বার্টনকে বললাম, 'বুঝতে পারছ—আমরাও ঠিক বলিনি, কর্ডোবাও ঠিক বলেনি। গুহাটা আদিমই বটে—সেখানে আমাদের অনুমান ঠিক। কিন্তু তার কিছু ছবি যে সম্প্রতি আঁকা—সেটাও ঠিক। কাজেই সেখানে কর্ডোবা ভুল করেনি!'

ডাম্‌বার্টন মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, 'পঞ্চাশ হাজার বছরের বুড়ো কেভম্যানের কথা লোকে বিশ্বাস করবে বলে মনে হয়?'

আমি হেসে বললাম, 'যারা আমাদের পুরাণের সহস্রায়ু মুনিঋষিদের কথা বিশ্বাস করে, তারা অন্তত নিশ্চয়ই করবে!'

সন্দেশ। ফাল্গুন, চৈত্র ১৩৭৫, বৈশাখ ১৩৭৬

www.BDeBooks.Com

প্রোফেসর শঙ্কু ও গোরিলা

১২ই অক্টোবর

আজ সকালে উশ্রীর ধার থেকে বেড়িয়ে ফিরছি, এমন সময় পথে আমার প্রতিবেশী অবিনাশবাবুর সঙ্গে দেখা। ভদ্রলোকের হাতে বাজারের থলি। বললেন, 'আপনাকে সবাই একঘরে করবে, জানেন তো। আপনি যে একটি আস্ত শকুনির বাচ্চা ধরে এনে আপনার ল্যাবরেটরিতে রেখেছেন, সে কথা সকলেই জেনে ফেলেছে।' আমি বললাম, 'তা করে তো করবে। আমি তো তা বলে আমার গবেষণা বন্ধ করতে পারি না।'

অবিনাশবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'তা আর কী করে করবেন ; কিন্তু তাই বলে আর জিনিস পেলেন না ? একেবারে শকুনি !'

শকুনির বাচ্চা যে কেন এনেছি তা এরা কেউ জানে না, কারণ আমি কাউকে বলিনি। শকুনির যে আশ্চর্য ঘ্রাণশক্তি আছে সেইটে নিয়ে আমি পরীক্ষা করছি। শকুনির দৃষ্টিশক্তিও অবিশ্যি অসাধারণ ; কিন্তু টেলিস্কোপ মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে মানুষও তার দৃষ্টিশক্তি অনেকটা বাড়িয়ে নিতে পারে। ঘ্রাণশক্তি বাড়ানোর কোনও উপায় কিন্তু আজ পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। সেটা সম্ভব কি না জানার জন্যই আমি শকুনি নিয়ে পরীক্ষা করছি। অবিশ্যি বৈজ্ঞানিকেরা গিনিপিগ জাতীয় প্রাণী নিয়ে যেসব নৃশংস পরীক্ষা করে, সেগুলো আমি মোটেই সমর্থন করি না। আমি নিজে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে কখনও কোনও প্রাণীহত্যা করিনি। শকুনিটাকেও কাজ হলে ছেড়ে দেব। ওটাকে আমারই অনুরোধে ধরে এনে দিয়েছিল একটি স্থানীয় মুণ্ডা জাতীয় আদিবাসী।

অবিনাশবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়িমুখো হব, এমন সময় ভদ্রলোক একটা অবান্তর প্রশ্ন করে বসলেন—'ভাল কথা—গোরিলা জিনিসটা তো আমরা কলকাতার জু গার্ডেনে দেখিচি, তাই না ?'

বুঝলাম ভদ্রলোকের জন্তুজানোয়ার সম্বন্ধে জ্ঞান খুবই কম। মুখে বললাম, 'মনে তো হয় না ; কারণ বাঁদর শ্রেণীর ও জন্তুটি ভারতবর্ষের কোনও চিড়িয়াখানায় কোনওদিন ছিল বলে আমার জানা নেই।'

খামখা তর্ক করতে অবিনাশবাবুর জুড়ি আর নেই। বললেন, 'বললেই হল। পষ্ট মনে আছে একটা জাল দিয়ে ঘেরা খোলা জায়গায় বসিয়ে রেখেছে, আমাদের দিকে ফিরে ফিরে মুখভঙ্গি করছে, আর একটা সিগারেট ছুড়ে দিতে দু আঙুলের ফাঁকে ধরে মানুষের মতো—'

আমি বাধা না দিয়ে পারলাম না।

—'ওটা গোরিলা নয় অবিনাশবাবু, ওটা শিম্পাঞ্জি। বাসস্থান আফ্রিকাই বটে, তবে জাত আলাদা।'

ভদ্রলোক চুপসে গেলেন।

—'ঠিক কথা। শিম্পাঞ্জিই বটে। ষাটের উপর বয়স হল তো, তাই মেমারিটা মাঝে মাঝে ফেল করে।'

এবার আমি একটা পালটা প্রশ্ন না করে পারলাম না।

'আপনার হঠাৎ গিরিডিতে বসে গোরিলার কথা মনে হল কেন?'

ভদ্রলোক তাঁর প্রায় তিনদিনের দাড়িওয়ালা গালে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'এই যে কাল কাগজে বেরিয়েছে না—আফ্রিকার কোথায় নাকি এক বৈজ্ঞানিক গোরিলা নিয়ে কী গবেষণা করছেন, আর তাঁর কী জানি বিপদ হয়েছে—তাই আর কী।'

আমি যখন কোনও জরুরি গবেষণার কাজে ব্যস্ত থাকি, তখন আমার খবরের কাগজটাগজ আর পড়া হয় না। তাতে আমার কোনও আক্ষেপ নেই, কারণ আমি জানি যে আমার ল্যাবরেটরিতে যেসব খবর তৈরি হয়, এবং বহুকাল ধরেই হচ্ছে, তার সঙ্গে পৃথিবীর অন্য কোনও খবরের কোনও তুলনাই হয় না। তবুও গোরিলার এই খবরটা সম্পর্কে আমার একটা কৌতূহল হল। জিজ্ঞেস করলাম, 'বৈজ্ঞানিকের নামটা মনে পড়ছে?'

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, 'দূর! আপনার নামই মাঝে মাঝে ভুলে যাই, তার আবার...আপনাকে বরং কাগজটা পাঠিয়ে দেব, আপনি নিজেই পড়ে দেখবেন।'

বাড়ি ফেরার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই অবিনাশবাবুর চাকর বলরাম এসে কাগজটা দিয়ে গেল।

খবরটা পড়ে ভারী আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বৈজ্ঞানিকটি আমার পরিচিত ইংলন্ডবাসী প্রোফেসর জেমস ম্যাসিংহ্যাম। কেমব্রিজে যেবার বক্তৃতা দিতে যাই, সেবার আলাপ হয়েছিল। প্রাণীতত্ত্ববিদ। একটু ছিটগ্রস্ত হলেও, বিশেষ গুণী লোক বলে মনে হয়েছিল।

খবরটা এসেছে আফ্রিকার কঙ্গো প্রদেশের কালেহে শহর থেকে। সেটা এখানে তুলে দিচ্ছি—

অরণ্যে নিখোঁজ

ইংলন্ডের বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ অধ্যাপক জেমস ম্যাসিংহ্যাম গত সাতদিন যাবৎ কঙ্গোর কোনও অরণ্যে নিখোঁজ হয়েছেন বলে জানা গেল। ইনি গত দুমাস কাল যাবৎ উক্ত অঞ্চলে গোরিলা সম্পর্কে গবেষণা করছিলেন, এবং সে সম্পর্কে প্রচুর নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন বলে জানা যায়। স্থানীয় পুলিশের সাহায্যে অন্তর্হিত অধ্যাপকের অনুসন্ধান চলেছে, তবে তাঁকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যাবে কি না সে বিষয় অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন।

খবরটা পড়ার আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি কেমব্রিজে আমার বন্ধু প্রাণীতত্ত্ববিদ ও পর্যটক প্রোফেসর জুলিয়ান গ্রেগরিকে একটা টেলিগ্রাম করে দিয়েছি। গ্রেগরিই ম্যাসিংহ্যামের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেয়। তার কাছ থেকে সঠিক খবরটা পাওয়া যাবে বলে আশা করছি।

১৫ই অক্টোবর

আজ শকুনির বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিলাম। ঘ্রাণশক্তির রহস্য উদ্ঘাটন হয়েছে বলে মনে হয়। তবে মানুষের পক্ষে এ শক্তি আয়ত্ত করা ভারী কঠিন। কোনও কৃত্রিম উপায়ে এটা সম্ভব বলে মনে হয় না। আমি নিজে আমার গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে একটা ওষুধ তৈরি করছি, এবং সেই ওষুধ দিয়ে একটা ইন্‌জেকশন নিয়েছি। তার ফল এখনও কিছু

www.BDeBooks.Com

পাইনি। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে এত শিক্ষাদীক্ষা সত্ত্বেও অনেক ব্যাপারে মানুষ জীবজন্তুর চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে।

গ্রেগরির কাছ থেকে এখনও উত্তর পেলাম না। সে কি তা হলে ইংলন্ডে নেই? গোরিলা সংক্রান্ত ঘটনাটা সম্পর্কে এখনও কৌতূহল বোধ করছি। অবিনাশবাবু আজ বললেন যে কঙ্গো থেকে আরেকটা খবরে বলা হয়েছে যে পুলিশ হাল ছেড়ে দিয়েছে এবং ম্যাসিংহ্যাম মৃত বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে।

১৬ই অক্টোবর

এইমাত্র গ্রেগরির টেলিগ্রাম পেলাম। বেশ ঘোরালো ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে। ও লিখছে—'অ্যাম প্রোসিডিং টু কালেহে স্যাটারডে স্টপ ক্যান ইউ কাম টু স্টপ বিলিভ ম্যাসিংহ্যাম ইজ অ্যালাইভ বাট ইন্ ট্রাবল স্টপ কেব্‌ল ডিসিশন ইমিডিয়েটলি।'

অর্থাৎ, শনিবার কালেহে রওনা হচ্ছি: তুমিও আসতে পার কি? আমার বিশ্বাস ম্যাসিংহ্যাম এখনও জীবিত, তবে সম্ভবত সংকটাপন্ন। কী ঠিক কর চটপট তার করে জানাও।'

আফ্রিকার এক ঈজিপ্ট ছাড়া আর কোনও দেশে এখনও যাওয়া হয়নি আমার। তা ছাড়া বছর খানেক থেকেই লক্ষ করছি যে জীবজন্তু সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা আমার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ইদানীং পাখির উপরেই জোরটা দিচ্ছিলাম। আমার বাবুইপাখির বাসা নিয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ 'নেচার' পত্রিকায় ছাপা হয়ে বিশেষ প্রশংসা পেয়েছে। শকুনির উপর কাজটাও শেষ হয়েছে ধরা যায়, এবং সেটা নিয়ে জানাজানি হলে যথারীতি বৈজ্ঞানিক মহলের প্রশংসা পাবই। এই ফাঁকে দিন পনেরোর জন্য কঙ্গোটা ঘুরে এলে মন্দ কী? জীবজন্তুর দিক থেকে বিচার করলে আফ্রিকার মতো দেশ আর নেই; আর মানুষের পূর্বপুরুষ যে বাঁদর, সেই বাঁদরের সেরা হল গোরিলা, আর সেই গোরিলার বাসস্থান হল আফ্রিকা। আমার পক্ষে এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা ভারী কঠিন। গ্রেগরিকে টেলিগ্রাম করে দেব—সী ইউ ইন কালেহে। ম্যাসিংহ্যামের যা-ই বিপদ হোক না কেন, তাকে উদ্ধার করা আমাদের কর্তব্য।

১৭ই অক্টোবর

আফ্রিকা সফরে যে আমার আবার একজন সঙ্গী জুটে যাবে সে কথা ভাবিনি। অবিশ্যি সেবার সেই রাক্ষুসে মাছের সন্ধানে সমুদ্রগর্ভে পাড়ি দেবার বেলাও ঠিক এই ব্যাপারই ঘটেছিল। সেবার যিনি সঙ্গ নিয়েছিলেন, এবারও তিনিই নিচ্ছেন; অর্থাৎ, আমার প্রতিবেশী অবৈজ্ঞানিকের রাজা শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার।

আজ সকালে আমার এখানে এসে আমাকে গোছগাছ করতে দেখেই ভদ্রলোক ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়েছিলেন। বললেন, 'যদ্দিন কূপমণ্ডূক হয়ে ছিলুম, বেশ ছিল। কিন্তু একবার ভ্রমণ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়েছি, আর কি মশাই চুপচাপ বসে থাকা যায়? আফ্রিকার কথা ছেলেবেলায় সেই কত পড়িচি—সেই জন্তুজানোয়ার, সেই কালো বেঁটে বেঁটে বুনো মানুষ...আপনি যাচ্ছেন সেই দেশে, আর আপনার সঙ্গ নেব না আমি? খবরটা তো প্রথম আমিই দিই আপনাকে। আর খরচের কথাই যদি বলেন তো সমুদ্রের তলা থেকে পাওয়া কিছু মোহর এখনও আছে আমার কাছে। আমার খরচ আমি নিজেই বেয়ার করব।'

আমি ভদ্রলোককে কত বোঝালাম যে সমুদ্রের তলার চেয়েও আফ্রিকার জঙ্গল অনেক বেশি বিপদসঙ্কুল জায়গা, সেখানে সর্বদা প্রাণটি হাতে নিয়ে চলাফেরা করতে হয়। অবিনাশবাবু তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, 'আমার কুষ্ঠীতে আছে আমার আয়ু সেভেনটি এইট। বাঘ সিংহ আমার ধারেকাছেও আসবে না।'

অগত্যা রাজি হতে হল। পরশু রওনা। অবিনাশবাবুকে বলে দিয়েছি যে ধুতি পাঞ্জাবি পরে আফ্রিকার বনে চলাফেরা চলবে না ; যেখান থেকে হোক তাঁকে এই দুদিনের মধ্যে কোট জোগাড় করে নিতে হবে।

২৩শে অক্টোবর

মধ্য আফ্রিকার বেলজিয়ান কঙ্গো প্রদেশের কালেহে শহর। সময় সন্ধ্যা সাড়ে ছটা। মিরান্ডা হোটেলে আমার ঘরের ব্যালকনিতে বসে ডায়রি লিখছি। দুদিন আগেই এখানে এসে পৌঁছেছি, কিন্তু এর মধ্যে আর লেখার ফুরসত পাইনি।

প্রথমেই বলে রাখি, আফ্রিকা অসাধারণ সুন্দর দেশ। বইয়ে পড়ে এদেশের সৌন্দর্য সম্বন্ধে কোনও ধারণাই করা যায় না। আমি যেখানে বসে লিখছি, সেখান থেকে পুব দিকে কিভু হ্রদ দেখা যাচ্ছে, আর উত্তর দিকে রুয়েনজোরি পর্বতশৃঙ্গ। জঙ্গলের যেটুকু আভাস পেয়েছি, তার তো কোনও তুলনাই নেই।

অবিশ্যি এইসব উপভোগ করার মতো মনের অবস্থা কতদিন থাকবে জানি না। গ্রেগরির সঙ্গে কথাবার্তায় যা বুঝেছি, ভাবনার কারণ আছে অনেক। যা জানলাম তা মোটামুটি এই—

ম্যাসিংহ্যাম গোরিলা সম্পর্কে গবেষণা করছিলেন বেশ অনেকদিন থেকেই। আগে একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে গোরিলা নাকি ভারী হিংস্র জানোয়ার, মানুষ দেখলেই আক্রমণ করে। সম্ভবত গোরিলার ভয়ংকর চেহারা থেকেই এ বিশ্বাসের উৎপত্তি। যে সব বৈজ্ঞানিকের উদ্যম ও সাহসের ফলে এ ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হয়, তাদের মধ্যে ম্যাসিংহাম একজন। অসীম সাহসের সঙ্গে গোরিলার ডেরার একেবারে কাছাকাছি গিয়ে দিনের পর দিন তাদের হাবভাব লক্ষ করে ম্যাসিংহ্যাম এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিলেন যে বিনা কারণে গোরিলা কখনও কোনও মানুষকে আক্রমণ করে না। বড়জোর নিজের বুকে চাপড় মেরে দুমদাম শব্দ করে এবং মুখ দিয়ে নানারকম আওয়াজ করে মানুষকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে।

এই তথ্য আবিষ্কার করার পর থেকে ম্যাসিংহ্যামের গোরিলা সম্পর্কে প্রায় নেশা ধরে যায়, এবং প্রতিবছরই দু-তিনবার করে আফ্রিকায় এসে গোরিলা নিয়ে নতুন নতুন গবেষণা করতে থাকে। একটি বাচ্চা গোরিলাকে সে ধরতে পেরেছিল এমন গুজবও শোনা যায়।

এবারেও সে এসেছিল সেই একই কারণে। কিন্তু অন্যান্যবার তার সঙ্গে বন্দুকধারী শিকারি থাকে, এবার ছিল মাত্র চারজন নিরস্ত্র কুলি। জঙ্গলের ভিতর ক্যাম্প করে কাজ করছিল ম্যাসিংহ্যাম, এবং রোজই কুলিদের নিষেধ অগ্রাহ্য করে যখন তখন একা একা বেরিয়ে পড়ছিল। মাসদেড়েক ওইভাবে চলার পর একদিন সে নাকি বেরিয়ে আর ফেরেনি। তারপর থেকে দশ দিন ধরে পুলিশের সার্চ পার্টি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ম্যাসিংহ্যামের কোনও সন্ধান পায়নি।

যে ব্যাপারে গ্রেগরির সবচেয়ে বেশি চিন্তা হচ্ছিল সেটা হচ্ছে এই যে আফ্রিকায় আসার কিছুদিন আগে থেকেই ম্যাসিংহ্যামের মধ্যে একটা আশ্চর্য পরিবর্তন তার বন্ধুরা লক্ষ করেছিল। তফাতটা শুধু তার স্বভাবে নয়, চেহারাতেও যেন বোঝা যাচ্ছিল। চুলগুলো

www.BDeBooks.Com

আগের চেয়ে অনেক বেশি রুক্ষ, চোখদুটো সর্বদাই যেন লাল, আর চাহনিতে একটা ত্রস্ত অথচ বিরক্ত ভাব। অনেকের ধারণা হয়েছিল যে ম্যাসিংহ্যাম বোধ হয় কোনও আফ্রিকান উদ্ভিজ্জ ড্রাগ জাতীয় জিনিস খাওয়া অভ্যাস করেছে, যার ফলে তার একটা বিশ্রী রকম নেশা হয়। আফ্রিকায় অনেক বুনো লোকরা এইসব শিকড় বাকল খেয়ে নেশা করে।

কথাটা শুনে আমি বললাম, 'এসব ড্রাগ খেয়ে তো অনেক মানুষ আত্মহত্যাও করে বলে শুনেছি।'

গ্রেগরি বলল, 'সে তো করেই। কিন্তু ম্যাসিংহ্যাম আত্মহত্যা করেছে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। কারণ তার সঙ্গে এবার অনেক জিনিসপত্র ছিল—সেগুলোও পাওয়া যাচ্ছে না।'

'জিনিসপত্র মানে ? বইখাতা ইত্যাদি ?'

'না। তার চেয়েও অনেক বেশি। সে এবার সঙ্গে করে একটি পোর্টেব্‌ল গবেষণাগার নিয়ে ঘোরাফেরা করছিল। আত্মহত্যা করলে সেসব জিনিসগুলো গেল কোথায় ? না, শঙ্কু—আমার বিশ্বাস সে বেঁচে আছে, এবং জঙ্গলের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে তার পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে, আর সে পরীক্ষা এমন জাতের যেটা সে কারুর কাছে প্রকাশ করতে চায় না।'

আমি বললাম, 'এত ঢাকাঢাকির কী প্রয়োজন থাকতে পারে সেটা আন্দাজ করতে পারছ ?'

গ্রেগরি কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'ইদানীং ম্যাসিংহ্যামের একটা অদ্ভুত ধারণা হয়েছিল যে পৃথিবীর যত প্রাণীতত্ত্ববিদ আছে—ইন্‌ক্লুডিং মি—তারা সবাই নাকি তার মৌলিক গবেষণার ফল আত্মসাৎ করে নিজেদের বলে চালাচ্ছে।'

'ইন্‌ক্লুডিং ইউ ?' আমি রীতিমতো অবাক হয়ে গেলাম কথাটা শুনে।

গ্রেগরি বললে, 'হ্যাঁ, তাই। যদিও তার গবেষণা ও আমার গবেষণার বিষয় ও রাস্তা সম্পূর্ণ আলাদা।'

'তা হলে বলতে হয় ওর সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।'

গ্রেগরি আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, 'কিন্তু কী ব্রিলিয়েন্ট লোক ছিল বলো তো ! আর কী আশ্চর্য সাহস ! ওর যদি সত্যিই কোনও অনিষ্ট হয়ে থাকে তা হলে বিজ্ঞানের সমূহ ক্ষতি হবে।'

আমি এবার জিজ্ঞেস করলাম, 'এসে অবধি গোরিলা চোখে পড়েছে একটাও ?'

গ্রেগরি বলল, 'একটিও না।'

'বলো কী ?'

'নট এ সিঙ্গল ওয়ান। অথচ যেখানে ওদের থাকার কথা সেসব জায়গায় এর মধ্যে আমি দুবার ঘুরে এসেছি। আমি তো ব্যাপারটা কিছুই কূলকিনারা করতে পারছি না। দেখ তুমি যদি পার।'

আগামীকাল গ্রেগরির সঙ্গে আমরাও সাফারিতে বেরোব। ওর আশাও ক্ষীণ হয়ে এসেছিল : আমি এসে পড়াতে তবু খানিকটা উদ্যমের সঞ্চার হয়েছে।

অবিনাশবাবু বেশ ভালই আছেন। নিজেই ঘুরেটুরে বেড়াচ্ছেন। পরনে ভাগনের টুইলের শার্ট, গিরিডির অবসরপ্রাপ্ত ব্যারিস্টার সুরেন ঘোষালের খাকি হাফপ্যান্ট, আর মাথায় একটা জীর্ণ খাকি সোলাটুপি—সেটা যে কার কাছ থেকে ধার করে আনা সেটা জানা হয়নি। আজ সকালে দেখি ভদ্রলোক কোত্থেকে একছড়া কলা কিনে এনেছেন। ভারতবর্ষের বাইরেও যে কলা পাওয়া যায় সে ধারণা ওঁর ছিল না। বললেন, 'গোরিলাও তো বাঁদরের জাত, সামনে পড়লে একটা কলা দিয়ে দেখা যাবে খায় কি না।'

২৫শে অক্টোবর সকাল সাড়ে ছ'টা

কাল সারাদিন ঘোরাঘুরির পর হোটেলে ফিরে আর ডায়রি লিখতে পারিনি, তাই আজ সকালেই কাজটা সেরে রাখছি।

রহস্য অদ্ভুত ভাবে ঘনিয়ে উঠেছে। ম্যাসিংহ্যাম যে বেঁচে আছে সে প্রমাণ আমরা পেয়েছি। এমনকী এও মনে হতে পারে যে সে সুস্থই আছে—অন্তত শরীরের দিক দিয়ে।

সকালে আমাদের বেরোতে বেরোতে প্রায় সাড়ে আটটা হয়ে গেল। দল বেশি বড় না। আমি, গ্রেগরি, অবিনাশবাবু, এখানকার একজন শিক্ষিত নিগ্রো শিকারি যুবক যোসেফ কাবালা, ও পাঁচজন বান্টু জাতীয় কুলি। কুলিদের সঙ্গে চলেছে আমাদের খাদ্য ও পানীয়, জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য কাটারি জাতীয় জিনিস, ও বিশ্রামের জন্য ফোল্ডিং চেয়ার, তেরপল, মাটিতে খাটানোর বড় ছাতা ইত্যাদি। কাবালার সঙ্গে বন্দুক ও টোটা রয়েছে, আর আমার কোটের পকেটে রয়েছে আমারই তৈরি অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র—অ্যানাইহিলিন পিস্তল। অবিনাশবাবু আবার তাঁর হাতে তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি একটি কাঁঠালকাঠের লাঠি নিয়েছেন—ভাবখানা যেন তার একটা ঘায়ে তিনি একটি মস্ত গোরিলাকে ধরাশায়ী করতে পারেন। ভদ্রলোকের ষাটের উপর বয়স আর প্যাকাটে চেহারা হলে কী হবে—এমনিতে বেশ শক্ত আছেন। উনি বলেন এককালে নাকি মুগুর ভাঁজতেন—তবে সেটা ওঁর অন্য অনেক কথার মতোই আমার বিশ্বাস হয় না।

পাহাড়ের গোড়া অবধি জিপে গিয়ে সেখান থেকে পায়ে হেঁটে জঙ্গলের ভিতর ঢুকলাম আমরা। এই জঙ্গল পাহাড়ের গা বেয়ে ক্রমশ উপর দিকে উঠেছে। আফ্রিকার দু'জাতের গোরিলার মধ্যে একটা—অর্থাৎ যাকে বলে মাউন্টেন গোরিলা—এই জঙ্গলেই পাওয়া যায়। অন্য জাতটা থাকে সমতলভূমিতে। ম্যাসিংহ্যাম পাহাড়ের জঙ্গলেই তাঁর গবেষণা চালাচ্ছিলেন। আমাদের আজকের গন্তব্যস্থল হচ্ছে ম্যাসিংহ্যাম যেখানে ক্যাম্প ফেলেছিলেন সেই জায়গা। গ্রেগরি এর আগেও একবার গেছে সেখানে, কিন্তু কিছুই পায়নি। নেহাৎ আমার অনুরোধেই সে দ্বিতীয়বার সেখানে চলেছে।

ডেভিড লিভিংস্টোন তাঁর লেখায় এইসব জঙ্গলের বর্ণনা দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, এসব জঙ্গল এত গভীর এবং গাছের পাতা এত ঘন যে ঠিক মাথার উপর সূর্য থাকলেও, পাতা ভেদ করে দু-একটা 'পেনসিল অফ লাইট' ছাড়া আর কিছুই মাটিতে পৌঁছাতে পারে না। কথাটা যে কতদূর সত্যি তা এবার বুঝতে পারলাম।

আমাদের ভারতীয়দের ধারণা যে বট-অশ্বত্থ গাছই বুঝি পৃথিবীর সবচেয়ে জাঁদরেল গাছ। এখানের কয়েকটা গাছ দেখলে তাদের সে গর্ব খর্ব হয়ে যায়। বাওবাব বলে এক রকম গাছ আছে যার গুঁড়ি মাঝে মাঝে এত চওড়া হয় যে, দশ জন লোক পরস্পরের হাত ধরে গাছটাকে ঘিরে ধরলেও তার বেড় পাওয়া যায় না। অবিশ্যি যে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি তাতে বাওবাব গাছ নেই। এ জঙ্গলের গাছের মাহাত্ম্য হচ্ছে দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে নয়। এক একটা সিডার ও আবলুশ গাছ প্রায় দুশো ফুট উঁচু। অবিশ্যি যতই উপরে উঠছি ততই বেশি করে পাইন বা ফার জাতীয় পাহাড়ি গাছ চোখে পড়ছে। এছাড়া লতাপাতা, অর্কিড ও ফার্নের তো কথাই নেই।

জন্তু জানোয়ার এখনও বিশেষ চোখে পড়েনি। বাঁদরের মধ্যে দুটি বেবুন চোখে পড়েছে, আর অন্য জানোয়ারের মধ্যে একটি উড়ন্ত কাঠবেড়ালি। আশ্চর্য জিনিস এটি। ভারতীয় কাঠবেড়ালির প্রায় দ্বিগুণ সাইজ, গায়ের রং বাদামি, আর শরীরের দুদিকে পায়ের সঙ্গে লাগানো দুটি ডানা। পা দুটো ফাঁক করে গাছের ডাল থেকে লাফ দিয়ে দিব্যি চলে যায়

www.BDeBooks.Com

এগাছ থেকে ওগাছে। ফ্লাইং স্কুইরল দেখে অবিনাশবাবু বললেন, 'ষাট বছর বয়সে জঙ্গলে ঘুরে যা এডুকেশন হচ্ছে, ইস্কুলে কলেজে মানেবই মুখস্থ করে তার সিকি অংশও হয়নি। এখানকার বাঘ ভাল্লুকও কি ওড়ে নাকি মশাই?'

প্রায় সাড়ে তিন মাইল হাঁটার পর প্রথম গোরিলার চিহ্ন চোখে পড়ল। পুরুষ গোরিলারা গাছের ডাল ভেঙে গাছেরই উপর একরকম মাচা তৈরি করে। স্ত্রী গোরিলা বাচ্চা নিয়ে সেই মাচার উপর রাত কাটায়, আর পুরুষটা নীচে মাটিতে থেকে পাহারা দেয়। এটা আমার জানা ছিল, এবং এইরকম একটা মাচা হঠাৎ আমার চোখে পড়ল।

গ্রেগরি বলল, 'এই মাচাটা আমরা এর আগের দিনও দেখেছি। তবে গোরিলারা এক মাচায় এক রাতের বেশি থাকে না। কাজেই এ মাচাটা যখন বেশ কিছু দিনের পুরনো, তখন কাছাকাছির মধ্যে গোরিলা থাকবে এমন কোনও কথা নেই।'

একটা গন্ধ মিনিটখানেক থেকে আমার নাকে আসছিল, গ্রেগরিকে সেটার কথা বলতে সে যেন কেমন অবাক হয়ে গেল। সে বলল, 'কোনও বিশেষ গন্ধর কথা বলছ কি ? আমি তো এক গাছপালার গন্ধ আর ভিজে মাটির গন্ধ ছাড়া কিচ্ছু পাচ্ছি না।'

আমি মাচার দিকে এগিয়ে গেলাম। গন্ধ দ্বিগুণ তীব্র হয়ে উঠল। এ গন্ধের সঙ্গে কি গোরিলার কোনও সম্পর্ক আছে ? আমার ইনজেকশন কি তা হলে এতদিনে কাজ করতে শুরু করল ? গন্ধটা যে বুনো সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, আর এমন গন্ধ এর আগে আমি কক্ষনও পাইনি।

গ্রেগরিকে এ বিষয় আর কিছু না বলে এগিয়ে চললাম। মিনিট দশেকের মধ্যে গন্ধটা মিলিয়ে এল। কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আবার সেটা আসতে শুরু করল। অবিনাশবাবুকে বাংলায় বললাম, 'আশেপাশের গাছের দিকে একটু চোখ রাখবেন তো—ওইরকম মাচা আরও দেখা যায় কি না।'

কিছুদূর যাবার পরেই আবার আমারই চোখে পড়ল আরেকটা গোরিলার মাচা। এবার আর আমার মনে কোনও সন্দেহ রইল না যে আমার ইনজেকশনের ফলে আমি প্রায় আধ মাইল দূর থেকে গোরিলার মাচার অস্তিত্ব বুঝতে পারছি।

দুপুর আড়াইটে নাগাদ আমরা ম্যাসিংহ্যামের ক্যাম্পের জায়গায় পৌঁছোলাম। মস্ত মস্ত ফার আর বাদামগাছে ঘেরা একটা পরিষ্কার, খোলা, প্রায়-সমতল জায়গা। জমিতে দুজায়গায় আগুন জ্বালানোর চিহ্ন, আর এখানে সেখানে তাঁবুর খুঁটির গর্ত রয়েছে। উত্তর দিকটা পাহাড়ের খাড়াই, আর দক্ষিণে ঢাল নেমে সমতলভূমির দিকে চলে গেছে। সকলেই বেশ ক্লান্তি অনুভব করছিলাম, তাই কাবালা কুলিদের বলল মাটিতে বসবার বন্দোবস্ত করে দিতে। দুপুরের খাওয়াটাও এখানেই সেরে নিতে হবে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে বিশ্রামের বন্দোবস্ত হয়ে গেল। একটা ক্যাম্পচেয়ারে বসে স্যান্ডউইচে কামড় দিতে গিয়ে লক্ষ করলাম অবিনাশবাবু আমাদের সঙ্গে না বসে একটু দূরে পায়চারি করছেন। কারণটা বোঝা আমার পক্ষে কঠিন হল না। পাছে গ্রেগরি তাঁকে কোনও প্রশ্ন করে বসে, এবং ইংরিজিতে তার উত্তর দিতে হয়, সেই আশঙ্কাতেই তিনি দূরে দূরে রয়েছেন। অবিনাশবাবুর ইংরিজি বলার ক্ষমতা ইয়েস নো ভেরি গুডের বেশি এগোয় না ; অথচ সব প্রশ্নের উত্তর তো আর এই তিনটি কথায় দেওয়া চলে না।

স্যান্ডউইচ খাওয়া সেরে চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে দূরের গাছপালা দেখছি, এমন সময় অবিনাশবাবুর গলা পেলাম—

'ও মশাই—এটা কী একবার দেখে যান তো।'

ভদ্রলোক দেখি একটা পাইনগাছের গুঁড়ির দিকে ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখছেন। গ্রেগরি

আর আমি এগিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি গাছের গুঁড়িতে ছুরি দিয়ে খোদাই করা এক লাইন ইংরিজি লেখা। সেটা অনুবাদ করলে এই দাঁড়ায়—

'তোমরা মূর্খ। যদি বাঁচতে চাও তো ফিরে যাও।'

খোদাইয়ের নমুনা দেখে মনে হল সেটা টাটকা। আমরা লেখাটা পড়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। এটা যে একটা আশ্চর্য আবিষ্কার সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কথা বললেন প্রথম অবিনাশবাবু, এবং তাঁর স্বরে রীতিমতো বিরক্তির ভাব—

'আমাদের সবাইকে মূর্খ বলছে! লোকটার ভারী আস্পর্ধা তো!'

গ্রেগরি বলল, 'এ লেখা কিন্তু এর আগের দিন ছিল না। আমরা পরশুই এখানে এসেছিলাম। অর্থাৎ এটা লেখা হয়েছে গতকাল। তার মানে ম্যাসিংহ্যাম কাল আবার এখানে এসেছিল।'

এটা যে ম্যাসিংহ্যামেরই লেখা, এবং এটা যে তার অনুসন্ধানকারীদের উদ্দেশ করেই লেখা হয়েছে, সে বিষয়ে আমার মনেও কোনও সন্দেহ ছিল না।

গ্রেগরি এবার অবিনাশবাবুর দিকে ফিরে বলল, 'এ মোস্ট ইউজফুল ডিসকাভারি। কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স!'

অবিনাশবাবু বললেন, 'ভেরি গুড।'

আমি মনে মনে বললাম, ভেরি গুড তো বটেই। এই লেখা থেকেই অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল যে ম্যাসিংহ্যাম মরেনি। সে দস্তুরমতো বেঁচে আছে, দিব্যি তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, এবং সে কাজে বাধা পড়ে সেটা সে মোটেই চাইছে না। কিন্তু সে কাজটা যে কী, এবং কোথায় সে আত্মগোপন করে রয়েছে, সেটা এখনও রহস্য।

আমরা হোটেলে ফিরলাম প্রায় রাত সাড়ে দশটায়। ফেরার পথেই স্থির করেছিলাম যে আমাদেরও জঙ্গলের ভিতর তাঁবু ফেলে কাজ চালাতে হবে।

ম্যাসিংহ্যাম শাসিয়েছে যে তার অনুসন্ধান যে করবে তার মৃত্যু অনিবার্য। সে জানে না সে একথাটা লিখে কতবড় ভুল করেছে। ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুকে এমন হুমকিতে যে হটানো যায় না, সে কথা তো আর ম্যাসিংহ্যাম জানে না। ভাবনা ছিল এক অবিনাশবাবুকে নিয়ে, কিন্তু তিনিও দেখছি বারবার বলছেন, 'লোকটার দম্ভটা একটু থেঁতলে দেওয়া দরকার।'

২৫শে অক্টোবর দুপুর দেড়টা

আমরা কিছুক্ষণ হল জঙ্গলে এসে ক্যাম্প ফেলেছি। ম্যাসিংহ্যাম যেখানে ক্যাম্প ফেলেছিল, সেখানেই। একটু বিশ্রাম করে দুপুরের খাওয়া সেরে আবার বেরোব। আজ মেঘলা করে রয়েছে বলে জঙ্গলের ভিতরে আরও অন্ধকার। এখানে আমাদের দেশের মতোই এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বৃষ্টি হয়। তবে এখন বৃষ্টি না হওয়াই ভাল ; হলে আমাদের কাজের অনেক ব্যাঘাত হবে।

আজ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আসতে আসতে একটা ভারী আশ্চর্য জিনিস লক্ষ করেছি ; সেটা এই ফাঁকে ডায়রিতে লিখে রাখি। কাল কয়েকটা বেবুন আর লেমুর ছাড়া বানরজাতীয় আর কিছুই চোখে পড়েনি, আর আজ সকাল থেকে এই চার ঘণ্টার মধ্যে সাত রকমের বাঁদর দেখেছি। আর আশ্চর্য এই যে তাদের সকলেরই হাবভাব যেন ঠিক একই রকম ; মনে হয় তারা সবাই যেন গভীর বন থেকে রীতিমতো ভয় পেয়ে বাইরের দিকে চলে আসছে। সে এক দৃশ্য! আমাদের মাথার উপরের গাছের পাতা আর লতাগুলো যেন একমুহূর্ত স্থির থাকতে পারছে না। সাঁই সাঁই সাঁই শব্দে লেমুর ম্যানড্রিল বেবুন শিম্পাঞ্জি সব পালিয়ে চলেছে মুখ

www.BDeBooks.Com

দিয়ে নানারকম ভয়ের শব্দ করতে করতে। আমাদের দিকে তাদের ভ্রূক্ষেপও নেই। এমন কেন ঘটছে তা এখনও ঠাহর করতে পারিনি। গ্রেগরি এর আগে তিনবার আফ্রিকার জঙ্গলে এসেছে, কিন্তু এমন দৃশ্য সে কখনও দেখেনি। এই যে বসে বসে ডায়রি লিখছি, এখনও তাদের চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পাচ্ছি। এই ঘটনাও কি ম্যাসিংহ্যামের সঙ্গে জড়িত ?

নিজেকে ভারী ব্যর্থ বলে মনে হয়েছে। এখনও পর্যন্ত একেবারে বোকা বনে আছি। অন্তত এটুকু যদি জানা যেত যে ম্যাসিংহ্যাম ঠিক কী কাজটা করছে, তা হলেও মনে হয় অনেক রহস্যের কারণ বেরিয়ে পড়ত।

২৬শে অক্টোবর ভোর পাঁচটা

ভোরের আলো এখনও ভাল করে ফোটেনি। তাঁবুতে বসে পেনলাইটের আলোতে আমার ডায়রি লিখছি। যে অদ্ভুত ভয়াবহ ঘটনাটা ঘটে গেল, সেটা এইবেলা লিখে না রাখলে পরে আর কখন সময় পাব জানি না। সত্যি কথা বলতে কী, পাইনগাছের গুঁড়িতে লেখা হুমকিটা আর অগ্রাহ্য করতে পারছি না। প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরতে পারব কি না সে বিষয়ও সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে।

কাল দুপুরে লাঞ্চের পর আমরা আবার উত্তর-পূর্বদিকের রাস্তা ধরে চলতে আরম্ভ করলাম। মাইলখানেক যাবার পর লক্ষ করলাম বাঁদরের গোলমালটা কমে এসেছে। গ্রেগরি বলল, 'মনে হচ্ছে গোরিলা ছাড়া যত বাঁদর ছিল সব বন ছেড়ে বাইরের দিকে পালিয়েছে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কারণ কিছু বুঝলে ?'

গ্রেগরি ভ্রূকুটি করে বলল, 'ভয় পেয়েছে এটুকু বুঝলাম, তার বেশি নয়।'

আমি প্রায় ঠাট্টার সুরেই বললাম, 'আমাদের দেশে যদি কোথাও একটা কাক মরে, তা হলে সে তল্লাটে যত কাক আছে সব কটা একজোটে ভীষণ চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে। এটাও কি সেই ধরনের ব্যাপার নাকি ?'

গ্রেগরি চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ থেকেই ওর মধ্যে একটা অবসন্ন ভাব লক্ষ করছি, যেটা বোধ হয় শারীরিক নয়, মানসিক। গ্রেগরির বয়স পঞ্চাশের উপর হলেও রীতিমতো স্বাস্থ্যবান লোক—ইয়ং বয়সে বিজ্ঞানের সঙ্গে খেলাধুলোও করেছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার কী হয়েছে বলো তো ?'

গ্রেগরি মাটির দিকে দৃষ্টি রেখে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'আমার মনে একটা সন্দেহ জাগছে যেটা এখন প্রকাশ করলে তুমি হাসবে, কিন্তু সেটা যদি সত্যি হয়, একমাত্র তা হলেই এইসব অদ্ভুত ঘটনাগুলোর একটা কারণ পাওয়া যায়। অথচ তাই যদি হয়, তা হলে তো...উঃ।—'

গ্রেগরি শিউরে উঠে চুপ করে গেল। আমিও তাকে আর প্রশ্ন করে বিরক্ত করলাম না। আমার নিজের সন্দেহটাও ডায়রিতে প্রকাশ করার সময় আসেনি। মনে হয় গ্রেগরি ও আমি একই পথে চিন্তা করে চলেছি—কারণ বিজ্ঞানের কী অসীম ক্ষমতা সেটা আমরা দুজনেই জানি।

কিছুক্ষণ থেকেই অনুভব করছিলাম যে আমরা নীচের দিকে চলেছি। এবার দেখলাম আমাদের সামনে একটা নালা পড়েছে। একটা ওকাপি জল খাচ্ছিল, আমাদের দেখেই পালিয়ে গেল। নালার জল গভীর নয়, কাজেই সেটা হেঁটে পার হতে আমাদের কোনও কষ্ট হল না।

নালা পেরিয়ে দশ পা যেতে না যেতেই একটা পরিচিত তীব্র গন্ধ এসে আমার নাকে প্রবেশ করল। আমি জানি সে গন্ধ আমি ছাড়া আর কেউ পায়নি। কাউকে কিছু না বলে

হেঁটে চললাম।

এবার যেটা চোখে পড়ল সেটা গাছের উপরে মাচা নয়—ভিজে মাটিতে গোরিলার পায়ের ছাপ। একটা নয় ; দেখে মনে হয় সম্ভবত পঞ্চাশটা ছোটবড় গোরিলা বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে সেখানে ঘোরাফেরা করেছে। কিন্তু কেন ?

কাবালা দেখি তার বন্দুক উঁচিয়ে তৈরি ; বুঝলাম সে রীতিমতো ঘাবড়ে গেছে। সে চাপা স্বরে বলল, 'একসঙ্গে এত গোরিলার পায়ের ছাপ আমি এর আগে কখনও দেখিনি। ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগছে না। যখন থেকে বাঁদরদের পালাতে দেখেছি, তখন থেকেই খটকা লাগতে শুরু করেছে।'

আমাদের বান্টু কুলিদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য লক্ষ করছিলাম, কাবালাকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, 'ওরা আর এগোতে চাইছে না।'

আমি বললাম, 'কেন ? ওদের কি ধারণা সামনে গোরিলার দল রয়েছে ?'

কাবালা বলল, 'হ্যাঁ।'

আমার নাকের গন্ধ কিন্তু বলছিল যে তারা কাছাকাছির মধ্যে নেই—কিন্তু সে কথা তো আর ওদের বললে বিশ্বাস করবে না !

এর মধ্যে গ্রেগরি হঠাৎ বলে উঠল, 'শঙ্কু, একবার ওপরের দিকে চেয়ে দেখো।'

মাথা তুলে এক আশ্চর্য জিনিস দেখলাম । চারিদিকের গাছের ডাল ভাঙা। গুঁড়িগুলো রয়েছে, কিন্তু ডালপালাগুলো সব কারা যেন ভেঙে সাফ করে নিয়ে গেছে।

গ্রেগরির দিকে চেয়ে দেখি তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। চাপা গলায় সে বলল, 'লেট্‌স গো ব্যাক, শঙ্কু !'

'কোথায় ?'

'আপাতত ক্যাম্পে ফিরে যাই চলো। আমাকে একটু চুপচাপ বসে ভাবতে হবে।'

'তোমার কি মনে হয় ডালগুলো গোরিলারা ভেঙেছে ?'

'তা ছাড়া আর কী। সম্প্রতি এমন ঝড় এখানে হয়নি যাতে ওইভাবে গাছের ডাল ভাঙবে। আর ওগুলোকে যে কাটা হয়নি সে তো দেখেই বুঝতে পারছ।'

সত্যি বলতে কী, আমারও ওই একই সন্দেহ হয়েছিল। যে গোরিলার পায়ের ছাপ মাটিতে দেখছি, তারাই গাছের ডালগুলো ভেঙেছে।

গ্রেগরির কথামতো ক্যাম্পে ফিরে আসতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। গরম কোকো খেয়ে ক্লান্তি দূর করে গ্রেগরির ক্যাম্পের বাইরে বসে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কী ভাবছ বলো তো ?'

গ্রেগরি তার শান্ত অথচ ভীত চোখদুটো আমার দিকে ফিরিয়ে বলল, 'আমার মনে হয় না আমরা ম্যাসিংহ্যামের সঙ্গে যুঝতে পারব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে তার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি এক নৃশংস কাজে ব্যবহার করতে চলেছে।'

আমি দৃঢ়স্বরে বললাম, 'তা হলে আমাদের কর্তব্য তাকে বাধা দেওয়া।'

গ্রেগরি বলল, 'জানি ! কিন্তু সে কাজটা করতে যে সামর্থ্যের প্রয়োজন সেটা আমাদের নেই ! সুতরাং আমাদের পরাজয় অনিবার্য।'

আমি বুঝতে পারলাম যে, এ অবস্থায় গ্রেগরির মনে উৎসাহ বা আশার সঞ্চার করা প্রায় অসম্ভব। মুখে বললাম, 'ঠিক আছে। এখন তো বিশ্রাম করা যাক—কাল সকালে দুজনের বুদ্ধি একজোট করলে একটা কোনও রাস্তা বেরোবে না, এটা আমি বিশ্বাস করি না।'

সন্ধ্যা থাকতে সকলেই টিনের খাবারে ডিনার সেরে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। তিনটি ক্যাম্পের একটিতে আমি আর অবিনাশবাবু একটিতে গ্রেগরি ও একটিতে কাবালা। বান্টু

www.BDeBooks.Com

কুলিগুলো বাইরে শোয়—তারা এখন আগুন জ্বালিয়ে জটলা করছে। একজন আবার গান শুরু করল। সেই একঘেয়ে গান শুনতে শুনতেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

মাঝরাত্রে কোনও এক সময়ে ঘুমটা ভাঙল অবিনাশবাবুর ঠেলাতে, আর ভাঙতেই কানের খুব কাছে তাঁর ফিসফিসে ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম—

'ও মশাই !—শিম্পাঞ্জি ! শিম্পাঞ্জি !'

'শিম্পাঞ্জি ?' আমি সটান উঠে পড়লাম। 'কোথায় দেখলেন ? কখন ?'

'এই তো, দশ মিনিটও হয়নি। এতক্ষণ গলাটা শুকিয়ে ছিল তাই কথা বলতে পারিনি।'

'কী হল ঠিক করে বলুন তো।'

'আরে মশাই, এরকম মাটিতে বিছানা পেতে তাঁবুর ভেতর শুয়ে তো অভ্যেস নেই—তাই ভাল ঘুম হচ্ছিল না এমনিতেই। কিছুক্ষণ আগে ভাবলুম বাইরে গিয়ে একটু ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়ে আসি। কনুইয়ে ভর করে কাঁধদুটোকে একটু তুলেছি, এমন সময় দেখি তাঁবুর দরজা ফাঁক করে ভিতরে উঁকি মারছে।'

কী যে উঁকি মেরেছে সেটা আমার বুঝতে বাকি নেই, কারণ তাঁবুর ভেতরটা আমার সেই পরিচিত গন্ধে ভরপুর হয়ে আছে। অনেক দিনের পুরনো ঝুলে ভরা গন্ধের সঙ্গে বারুদের গন্ধ মেশালে যেমন হয়, কতকটা সেই রকম গন্ধ।

অবিনাশবাবু বলে চলেছেন—

'কলকাতার চিড়িয়াখানায় যেরকম দেখেছি ঠিক সেরকম নয়। সাইজে অনেক বড়, বিরাট চওড়া কাঁধ, আর অর্ধেক মুখ জুড়ে দুই নাকের ফুটো, আর হাত দুটো—'

আমি অবিনাশবাবুর কথা শেষ হবার আগেই ক্যাম্পের বাইরে চলে এসেছি, হাতে আমার পিস্তল। আকাশের মেঘ কেটে গিয়ে চারিদিকে চাঁদের আলো থই থই করছে, সাদা তাঁবুগুলো সেই আলোয় ঝলমঝল করছে। জঙ্গল নিঝুম নিস্তব্ধ। বান্টু কুলিগুলো আগুনের ধারে পড়ে ঘুমোচ্ছে। অন্য তাঁবু দুটিতেও মনে হল দুজনেই ঘুমোচ্ছে। তবু গ্রেগরিকে খবর দেওয়া দরকার মনে করে তার তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেলাম।

তাঁবুর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দুবার তার নাম ধরে ডেকেও সাড়া না পেয়ে ভারী আশ্চর্য লাগল—কারণ আমি জানি গ্রেগরির ঘুম খুব পাতলা। তবে সে উঠছে না কেন ?

দরজা ফাঁক করে ভেতরে ঢুকেই চমকে উঠলাম।

গ্রেগরির বিছানা খালি পড়ে আছে। বালিশ চাদর সবই রয়েছে, এবং সেগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু এখন আর সেখানে কেউ নেই।

বালিশে হাত দিয়ে দেখলাম গরম ; অর্থাৎ অল্পক্ষণ আগেও সে ছিল।

অবিনাশবাবু ধরা গলায় বললেন,—'লোকটা গেল কোথায় ?'

আমি বললাম, 'গোরিলার কবলে।'

একটি গোরিলা এসে প্রথমে আমাদের ক্যাম্পে উঁকি মেরেছে। তারপর গ্রেগরির ক্যাম্পে ঢুকে তাকে কোলপাঁজা করে তুলে নিয়ে গেছে—কোথায়, তা এখনও জানি না।

কাবালার গলা শুনতে পাচ্ছি। ওকে ব্যাপারটা বলি। ওর উপর এখন অনেকখানি ভরসা রাখতে হবে।

২৬শে অক্টোবর

একটা ভয় ছিল যে কাবালা বেগতিক দেখে আমাদের পরিত্যাগ করবে। কিন্তু তা তো হয়ইনি, বরং সে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে লেগেছে।

আজ সকাল সাতটায় আমরা ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়েছি। দিনের আলো পরিষ্কার হলেই দেখেছিলাম তাঁবুর বাইরে গোরিলার পায়ের ছাপ। সেই ছাপ ধরে প্রায় দু মাইল পথ এসেছি আমরা। আশ্চর্য এই যে ছাপটা আমাদের পাহাড়ের জঙ্গল ছেড়ে সমতল ভূমির জঙ্গলের দিকে নিয়ে চলেছে। নিয়মমতো এদিকে মাউন্টেন গোরিলা থাকার কথাই নয়, এবং এদিকটায় ম্যাসিংহ্যামকে খোঁজাই হয়নি। একটা নালা পেরিয়ে উলটো দিকে এসে ছাপটা আর খুঁজে পাইনি। তার একটা কারণ হতে পারে এই যে এদিকের জমিটা আরও অনেক বেশি শুকনো আর পাথুরে। সামনে একটা টিলার মতো রয়েছে, সেটার নীচে আমরা বিশ্রামের জন্য বসেছি। আজ আমরা প্রথম থেকেই ঠিক করেছি যে আর পিছনে ফিরব না, যেখানে সন্ধে হবে সেখানেই ক্যাম্প ফেলব। কুলিগুলো এখনও রয়েছে। গ্রেগরির অন্তর্ধানের ফলে তারা খুঁতখুঁত করতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু বেশি করে বকশিস দেওয়াতে তারা রয়ে গেছে।

অবিনাশবাবুর গলা পাচ্ছি। আমাকেই ডাকছেন। দেখি কী হল।

২৭শে অক্টোবর

এমন বিভীষিকাময়, অথচ এমন রোমাঞ্চকর ঘটনার বিবরণ লিখতে যে ভাষার দরকার হয় সেটা আমার জানা নেই। কাল বিকেল থেকে পর পর যা ঘটেছে তা সহজ ভাবে লিখে যাব, তাতে কতটা বোঝাতে পারব জানি না।

কাল ডায়রি লিখতে লিখতে অবিনাশবাবুর ডাক শুনে উঠে গিয়ে দেখি তিনি টিলার উপর দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর দৃষ্টি উলটো দিকে। কী জানি একটা দেখতে পেয়ে ভদ্রলোক তারস্বরে আমার নাম ধরে ডাকছেন। আমায় দেখেই বললেন, 'শিগগির উঠে আসুন।'

কাবালা নালায় গিয়েছিল হাত মুখ ধুতে—এখনও ফেরেনি। আমি একাই গিয়ে টিলার উপরে উঠলাম। তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই অবিনাশবাবু কাঁপা গলায় বললেন, 'কুষ্ঠী বোধ হয় মিলল না।' তারপর তাঁর কম্পমান ডান হাতটা তুলে দক্ষিণের সমতলভূমির জঙ্গলের দিকে নির্দেশ করলেন। যা দেখলাম তাতে আমারও আতঙ্ক হওয়া উচিত, কিন্তু দৃশ্যটা এতই অদ্ভুত ও অভূতপূর্ব যে ভয় না পেয়ে সম্মোহিতের মতো চেয়ে রইলাম।

আন্দাজ প্রায় একশো গজ দূর থেকে একটা গোরিলার দল আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তারা সংখ্যায় কত হবে জানি না, তবে শ'খানেকের কম নয়। গাছ থাকার জন্য তাদের সবাইকে একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে না, আর প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে তারা যেন সংখ্যায় আরও বেড়ে যাচ্ছে। কাবালাও এরমধ্যে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ; সে শুধু বলল, 'কুলিগুলো পালিয়েছে।' আমাদের দুজনের কাছেই অস্ত্র রয়েছে, কিন্তু সে অস্ত্র এই গোরিলাবাহিনীর সামনে কিছুই না।

এত বিপদেও চোখের সামনে মৃত্যুকে এগিয়ে আসতে দেখেও, পালাবার কথা চিন্তা করতে পারলাম না। অবিনাশবাবু মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছেন, আর অস্ফুটস্বরে কেবল বলছেন, 'মা, মা মাগো !' কাবালা ফিসফিস করে বলল, 'তুমি যা করবে, আমিও তাই।' আমি কথা না বলে হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিলাম—যা থাকে কপালে—দাঁড়িয়ে থাকব।

www.BDeBooks.Com

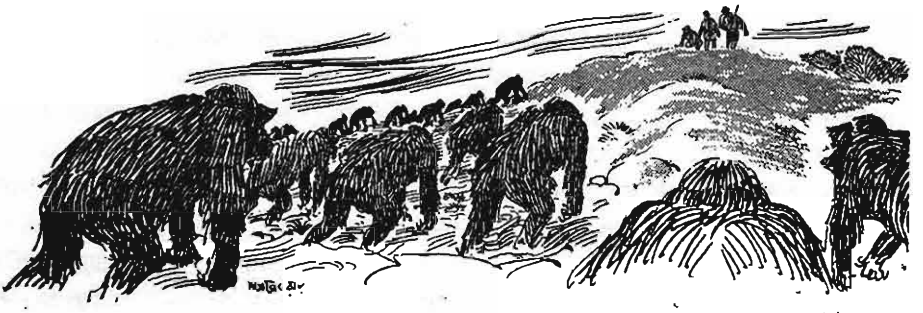

গোরিলাগুলো পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে পড়েছে। তাদের গায়ের গন্ধে আমার নাক প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে। কোনওদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে এগিয়ে আসছে তারা। এবার লক্ষ করলাম, কোনও কোনও গোরিলা আবার সঙ্গে শিকার নিয়ে চলেছে; কোনওটার কাঁধে হরিণ, কোনওটার কাঁধে বুনো শুয়োর, আবার দুটোর হাতে দেখলাম ভেড়া। এসব জিনিস কিন্তু গোরিলার খাদ্য নয়; এরা নিরামিষাশী—ফলমূল খেয়ে থাকে।

কাবালা হঠাৎ সামনের গোরিলাটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ওটার মাথায় কী বলো তো?'

ওই গোরিলাটাই বোধ হয় দলপতি—এবং গোরিলা যে এত বড় হয় সেটা আমার ধারণাই ছিল না। দেখলাম তার মাথায় কী যেন একটা জিনিস রোদের আলোয় চকচক করছে।

ক্রমে গোরিলাগুলো দশ গজের মধ্যে এসে পড়ল। ঠিক মনে হয় একটা কালো লোমশ অরণ্য আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ করে ভারী অদ্ভুত লাগল। সেটা হল তাদের চোখের ভাব। কেমন যেন একটা থমকানো মুহ্যমান ভাব। যন্ত্রচালিতের মতো দৃষ্টিহীন ভাবে যেন এগিয়ে আসছে তারা। একটা গোরিলা একটা পাথরের সঙ্গে ঠোক্কর খেল; কিন্তু তাতে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। সামলে নিয়ে আবার এগিয়ে আসতে লাগল।

অবিনাশবাবু বোধ হয় অজ্ঞান। কাবালাও হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে। ...

আমরা মরিনি। আমাদের পাশ দিয়ে গা ঘেঁষে গোরিলার দল চলে গেছে। যখন আমাদের সঙ্গে ধাক্কা লাগার উপক্রম হয়েছে, তখন পাশে সরে গেছি। অবিনাশবাবুকে কাবালা কোলে তুলে নিয়েছিল। কারও কোনও অনিষ্ট হয়নি, কেউ জখম হয়নি। এমনকী একথাও মনে হয়েছে যে গোরিলাগুলো যেন আমাদের দেখতেই পায়নি। চোখ থেকেও যেন তারা দৃষ্টিহীন, এবং দৃষ্টিহীন ভাবেই তারা গন্তব্য স্থানের দিকে এগিয়ে গেছে।

গোরিলার পায়ের আর নিশ্বাসের শব্দ মিলিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পর অবিনাশবাবু জ্ঞান ফিরে পেলেন। আমিও টিলার উপর বসে পড়েছিলাম। এমন একটা অভিজ্ঞতার পর আর পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। অবিনাশবাবুই প্রথম মুখ খুললেন। বললেন, 'আমার কুষ্ঠীর জোরটা দেখলেন?'

কথাটা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু অবিনাশবাবুর কথায় কান দেবার সময় নেই আমার। আজ প্রথম আমি অন্ধকারের মধ্যে আলো দেখতে পেয়েছি। এখন আমাদের রাস্তা একটাই—গোরিলা যে পথে গেছে সেই পথে যাওয়া। তবে আজ আর নয়; আজ বেলা হয়ে গেছে। কাল ভোরে রওনা হব। অনেক পায়ের ছাপ পড়েছে মাটিতে। অনায়াসে

সেই ছাপ অনুসরণ করে চলতে পারব। আমার বিশ্বাস ওই পায়ের ছাপই আমাদের ম্যাসিংহ্যামের সন্ধান দেবে। আমি জানি আমাদের অভিযান চূড়ান্ত অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। জয়-পরাজয় মরণ-বাঁচন সবই কালকের মধ্যেই নির্ধারিত হয়ে যাবে।

২৭শে অক্টোবর, রাত ২টা

এর মধ্যেই যে আবার ডায়রি লিখতে হবে তা ভাবিনি। কিন্তু এসব ঘটনা টাটকা লিখে ফেলাই ভাল। এই প্রথম আমার অ্যানাইহিলিন পিস্তল ব্যবহার করতে হল। এ ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। ঘটনাটা বলি।

গোরিলাদের দল চলে যাবার এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা নিজেরাই টিলার পাশে ক্যাম্প ফেলে রাত্রিযাপনের আয়োজন করে নিয়েছিলাম। এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনার পর রাত্রে ঘুম হবে না মনে করে আমরা তিনজনেই একটা করে আমার তৈরি সম্‌নোলিন বড়ি খেয়ে নিয়েছিলাম। রিস্টওয়াচে সাড়ে পাঁচটার সময় অ্যালার্ম দিয়ে আমরা আটটার মধ্যেই সকলে যে যার বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম।

আমার ঘুমটা ভেঙে গেল একটা বাজের শব্দে। উঠে বুঝতে পারলাম বাইরে বেশ ঝোড়ো হাওয়া বইছে, আর তার ফলে তাঁবুর কাপড়টা কেঁপে কেঁপে উঠছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আর তাঁবুর দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরেটা দিনের মতো আলো হয়ে উঠেছে। অথচ এরমধ্যে অবিনাশবাবু দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। ভাবলাম একবার উঠে গিয়ে দেখি কাবালার তাঁবুটা ঠিক আছে কি না।

দরজা ফাঁক করে বাইরে আসতেই ঝড়ের তেজটা বেশ বুঝতে পারলাম। আকাশে চাঁদের বদলে কালো মেঘ প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছে।

কাবালার তাঁবুর দিকে চাইতেই একঝলক বিদ্যুতের আলোতে সাদা তাঁবুর সামনে একটি অতিকায় কালো জন্তুকে দেখতে পেলাম। সেটা কাবালার তাঁবুর দিক থেকে আমাদের তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসছে। আমার হাতে টর্চ ছিল, সেটা জন্তুটার দিকে ফেলতেই তার চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। গোরিলা—কিন্তু ঠিক সাধারণ গোরিলা নয়। সচরাচর একটা বড় সাইজের গোরিলা ছ'ফুটের বেশি লম্বা হয় না। এটার হাইট অন্তত আট ফুটের কম না। মানুষের মতো দুপায়ে হেঁটে সেই আট ফুট লম্বা ও পাঁচ ফুট চওড়া দানবটা এগিয়ে আসছে আমারই তাঁবুর দিকে।

মনে মনে বললাম—এটাই তো স্বাভাবিক। গ্রেগরিকে ধরে নিয়ে গেছে, এবার তো আমাকেই নেবার পালা। আমিও যে ম্যাসিংহ্যামের অনুসন্ধান করছি, আর আমিও যে বৈজ্ঞানিক—সুতরাং আমার উপর তো তার আক্রোশ হবেই!

অবিশ্যি এত কথা ভাববার আগেই আমি তাঁবুতে ফিরে এসে আমার ব্রহ্মাস্ত্রটি বার করে নিয়েছিলাম। সেটা হাতে করে বাইরে বেরোতেই একেবারে গোরিলার মুখোমুখি হয়ে গেলাম। কিছু বুঝতে পারার আগেই জানোয়ারটা একটা লাফ দিয়ে তার বিশাল লোমশ হাতদুটো দিয়ে আমাকে জাপটে ধরল। আমি সেই মুহূর্তেই আমার সাড়ে তিন ইঞ্চি লম্বা পিস্তলটা তার বুকের উপর ধরে বোতামটা টিপে দিলাম। একটা তীক্ষ্ণ শিসের মতো শব্দ হল, আর পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে অতিকায় গোরিলাটা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

এদিকে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। তাঁবুতে ফিরে আসব, এমন সময় বিদ্যুতের আলোতে দেখি, যেখানে গোরিলাটা ছিল সেখানে মাটিতে একটা চকচকে ধাতুর জিনিস পড়ে আছে। জিনিসটা হাতে নিয়ে তাঁবুতে ঢুকে ল্যাম্পের আলোয় দেখে বুঝলাম সেটা একটা বৈদ্যুতিক

www.BDeBooks.Com

যন্ত্র। এরকম যন্ত্র এর আগে আমি আর কখনও দেখিনি। সকালে এটাকে পরীক্ষা করে দেখব ব্যাপারটা কী। এখন বেজেছে রাত দেড়টা। আপাতত আরেকটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।

২৯শে অক্টোবর

ম্যাসিংহ্যাম অনুসন্ধান পর্বের শেষে আমার মনের বর্তমান অবস্থার বর্ণনা দেওয়া ভারী কঠিন। আনন্দ, দুঃখ, আতঙ্ক, অবিশ্বাস—সব মিলিয়ে মনটা কেমন যেন জট পাকিয়ে গেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগছে এই ভেবে যে ম্যাসিংহামের মতো পণ্ডিত ব্যক্তিরও এই দশা হতে পারে। মানুষের মস্তিষ্কের ব্যাপারটা চিরকালই বোধ হয় জটিল রহস্য থেকে যাবে।...

গোরিলা-সংহারের পর সাড়ে তিন ঘণ্টা মাত্র ঘুমিয়েছিলাম। ঘুম ভাঙতে একটু অবাক হয়ে দেখি অবিনাশবাবু আমার আগেই উঠে বসে আছেন। বললেন, 'ওটা কী রেখেছেন মাথার পাশে—কোঁ কোঁ শব্দ করছে?'

সত্যিই তো!—গোরিলার জায়গায় যে ধাতুর জিনিসটা পেয়েছিলাম, সেটা আমার বালিশের পাশেই রাখা ছিল। ঠিক এরকমই একটা জিনিস সেদিন গোরিলাবাহিনীর দলপতির মাথায় লাগানো দেখেছিলাম। এখন দেখি সেই যন্ত্রটার ভিতর থেকে একটা মিহি সাইরেনের মতো শব্দ বেরোচ্ছে। আমি সেটা হাতে তুলে নিলাম। শব্দ থামল না।

জিনিসটা দেখতে একটা ছোট্ট বাটির মতো—মনে হয় ইস্পাত জাতীয় কোনও ধাতুর তৈরি। 'বাটির' দুদিকে দুই কানায় দুটো বাঁকানো পাতের মতো জিনিস রয়েছে। সেটা ফাঁক করে মাথার উপর নামিয়ে দিলে মাথার দুপাশে আটকে যায়। ফলে বাটিটা মাথার উপর উপুড় হয়ে বসে যায়—একেবারে ঠিক ব্রহ্মতালুতে। বাটির ভিতরে দেখলাম ছোট ছোট আশ্চর্য জটিল সব বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি রয়েছে।

অবিনাশবাবু বললেন, 'ওটা পেলেন কোথায়? কাল রাত্তিরেও তো দেখিনি। এর আগে ওরকম জিনিস কোথায় দেখেচি বলুন তো—কেমন যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে!'

পরীক্ষার প্রথম ধাপ হিসেবে পাতদুটোকে দুহাতে ধরে ফাঁক করে বাটিটাকে উপর দিকে রেখে যন্ত্রটা ঠিক গোরিলার মতো করে মাথায় পরে ফেললাম, আর পরামাত্র আমার শরীরের মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা শিহরন খেলে গেল।

তারপর আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম তার আগেই আসল যা ঘটনা সব ঘটে গেছে। মিরান্ডা হোটেলের বারান্দায় বসে আমি অবিনাশবাবুর মুখে সে সমস্ত ঘটনা শুনি, আর শুনে অবধি মনে হচ্ছে—ভাগ্যিস অবিনাশবাবু সঙ্গে ছিলেন!

আমার কী হয়েছিল জিজ্ঞেস করাতে অবিনাশবাবু বলতে শুরু করলেন—

আরে মশাই, আপনি বলছেন আপনি অজ্ঞান হয়েছিলেন, কিন্তু অজ্ঞান তো কই কিছু বুঝলুম না। যন্ত্রটা মাথায় পরলেন, তারপর তিড়িং করে একটা লাফ দিয়েই বেশ যেন একটা ফুর্তির সঙ্গে তাঁবু থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন। আমি ভাবলুম আপনি কিছু পরীক্ষা টরীক্ষা করতে গেছেন, এক্ষুনি ফিরবেন। ওমা—দশ মিনিট গেল, বিশ মিনিট গেল—কোনও পাত্তাই নেই আপনার। তখন কেমন যেন একটা সন্দেহ হল। আমিও বাইরে বেরোলুম,

এদিক ওদিক দেখলুম, টিলায় উঠলুম—কিন্তু কোথাও আপনার কোনও চিহ্ন দেখতে পেলুম না। অন্য তাঁবুটার কাছে গিয়ে দেখি ওই যে কাফ্রি ছোকরাটা—ক্যাবলা না কী নাম—সে তাঁবুর পাশে দাঁড়িয়ে মাটির দিকে চেয়ে কী জানি দেখছে। আমায় দেখেই বললে, 'গোরিলা এসেছিল রাত্রে। প্রোফেসর ঠিক আছেন তো ?'

আমি বললুম, 'প্রোফেসর উইথ সাইনিং হেডক্যাপ গো আউট হাফ-অ্যান-আওয়ার।'

শুনে সে ভারী ব্যস্ত হয়ে বললে, 'আমাদের এক্ষুনি বেরোতে হবে। মাটিতে নিশ্চয়ই প্রোফেসরের পায়ের ছাপ পড়েছে। সেই ছাপ আমাদের ফলো করতে হবে।'

ভাবলুম জিজ্ঞেস করি সে কীসের আশঙ্কা করছে, কিন্তু ইংরিজি মাথায় এল না, তাই চুপ করে গেলুম।

দশ মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে পড়লুম। তাঁবুর বাইরে থেকেই পায়ের ছাপ শুরু হয়েছে—সেই ধরে এগিয়ে চললুম। কিন্তু আশ্চর্য কী জানেন ? সেই ছাপ কোথায় গিয়ে মিশেছে জানেন ? সেদিনের পাঁচশো গোরিলার পায়ের ছাপের সঙ্গে। সেগুলো যেদিকে গেছে, আপনিও সেদিকেই গেছেন। দেখে কী মনের অবস্থা হয় বলুন তো ? তবে আপনার ছাপটা টাটকা বলে সেটা আরও স্পষ্ট, তাই পথ হারাইনি কোথাও।

দুপুর নাগাদ হাঁটতে হাঁটতে এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছোলুম যেখানে জঙ্গলটা ঘন হয়ে গিয়ে প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে। প্রকাণ্ড বড় বড় গাছ—একটারও নাম জানি না, আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার—একটি শব্দ নেই। পাখি জানোয়ার ব্যাঙ ঝিঁঝি কাক চড়ুই তক্ষক কিচ্ছু না। এমন থমথমে বন এক স্বপ্নেই দেখিচি। ঠিক মনে হয় যেন মড়ক লেগে সব কিছু মরেটরে ভূত হয়ে গেছে।

তবে তারমধ্যেও দেখলুম আপনার পায়ের ছাপ ঠিকই রয়েছে ; আর দেখলে মনে হয়—অন্তত ক্যাবলা তাই বললে—যে আপনি যেন যাকে বলে দৃপ্ত পদক্ষেপেই এগিয়ে চলেছেন।

আরও দশ মিনিট চলার পরেই কী সব যেন শব্দ কানে আসতে লাগল—দুমদাম ধুপধাপ খচখচ—নানারকম শব্দ। ক্যাবলা দেখি তার বন্দুকটাকে বাগিয়ে ধরেছে। আমার কিছুই ধরার নেই—এমনকী লাঠিখানাও ছাই তাঁবুতে ফেলে এসেছি—তাই ক্যাবলার কাঁধখানাই খাবলে ধরলুম।

কিছুটা পথ চলার পর এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলুম, আর সেই সঙ্গে শব্দের কারণও বুঝতে পারলুম। আমার তো এমনিতে মৃত্যুভয় নেই, কারণ জানি সেভেনটি এইটের আগে মরব না, কিন্তু তাও যা দেখলুম তাতে গলা শুকিয়ে রক্ত জল হয়ে গেল।

দেখি কী—বনের মধ্যিখানে একটা খোলা জায়গা। আগে খোলা ছিল না—আশেপাশের সব গাছফাছ কেটে জায়গাটাকে পরিষ্কার করা হয়েছে। সেই খোলা জায়গার মধ্যিখানে রয়েছে কাঠের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা কাঠের তৈরি একটা বেশ বড় রকমের বাড়ি। পাঁচিলের মধ্যিখানে আমরা যেদিক দিয়ে আসছি সেদিকে রয়েছে একটা ফটক। আর সেই ফটক আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক প্রহরী। কিন্তু সে প্রহরী মানুষ নয়, সে এক সাক্ষাৎ দানবতুল্য গোরিলা। আমাদেরই দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটা, অথচ দেখে মনে হয় সেটা যেন আমাদের দেখতেই পাচ্ছে না।

ফটকের ফাঁক দিয়ে ভেতরের কম্পাউন্ডটা দেখা যাচ্ছিল ; সেখানে দেখি কী অন্তত পক্ষে শ'দুয়েক গোরিলা। তাদের কেউ টহল ফিরছে, কেউ মোট বইছে, কেউ কাঠ কাটছে, আর আরও কত কী যে করছে যা বাইরে থেকে ভাল বোঝাও যায় না।

আপনার পায়ের ছাপ বলছে যে আপনি সটান ওই ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেছেন।

www.BDeBooks.Com

কোথায় গেছেন, বেঁচে আছেন কি মরে গেছেন, তা মা গঙ্গাই জানেন। আমি তো কিংকর্তব্যবিমূঢ়, কিন্তু ক্যাবলা দেখলুম আদপেই ঘাবড়ায়নি। বললে, 'ভেতরে যাওয়া দরকার, কিন্তু বুঝতেই পারছ—ফটক দিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ, আর বন্দুকটা থেকেও না থাকার সামিল।'

আমি বললুম, 'দেন হোয়াট ইউ ডুইং ?'

ক্যাবলা উত্তর দিলে না। সে মাথা তুলে এদিক ওদিক গাছের দিকে চেয়ে দেখতে লাগল। তারপর একটা প্রায় মনুমেন্টের মতো গাছের উপরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, ওই যে দেখছ ঝুলন্ত লতাটা গাছের ডালের সঙ্গে পাকিয়ে রয়েছে, মনে হচ্ছে ওইটের প্যাঁচ খুলে ঝুলে পড়লে ওই কাঠের বাড়ির চালে পৌঁছানো যাবে।

আমি বললুম, 'হু গো ?'

ক্যাবলা বললে, 'আমি তো যাবই, কিন্তু তুমি বাইরে একা থেকে কী করবে ? আর তোমার বন্ধু তো ভিতরে। আমার মতে দুজনেরই যাওয়া উচিত।'

বললুম, 'বাট গোরিলা ?'

ক্যাবলা বললে, 'আমার ধারণা গোরিলারা ম্যাসিংহামের আদেশ ছাড়া কিছু করবে না। ম্যাসিংহাম কিছু জানতে না পারলেই হল। চলো—সময় বেশি নেই—আর গ্রেগরি শঙ্কু দুজনেই বিপন্ন।'

বলব কী মশাই—ছেলেবেলায় টার্জানের বই দেখে কত আমোদ হয়েছে, কিন্তু সেই আফ্রিকার জঙ্গলে এসে কোনওদিন যে আবার আমাকেই টার্জানের ভূমিকা নিতে হবে সে তো আর কস্মিনকালেও ভাবতে পারিনি !

ক্যাবলা দেখলুম চোখের নিমেষে ওই রামঢ্যাঙা গাছটা বেয়ে তরতরিয়ে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ হাত উপরে উঠে গেল। তারপর লতাটার নাগাল পেয়ে সেটার প্যাঁচ খুলতে শুরু করল। খোলা হলে পর সেটা ছেড়ে দিতেই সেটা মাটিতে পৌঁছে গেল। ক্যাবলা প্রথমে সেই লতা বেয়ে মাটিতে নেমে চোখের একটা আন্দাজ করে নিলে। তারপর লতার মুখটা হাতে ধরে গুঁড়ি বেয়ে গাছের আরেকটা ডালে গিয়ে উঠলে। সেখান থেকে সে আমায় ইশারা করে বুঝিয়ে দিলে যে সে লতাটা ধরে ঝুলে পড়ে দোল খেয়ে কাঠের বাড়ির ছাতে গিয়ে নামছে ; নেমেই সে লতাটাকে আবার ছেড়ে দিয়ে আমার দিকে ফেরত পাঠিয়ে দেবে। আমি যেন ঠিক সেই ভাবেই দোল খেয়ে চলে যাই ; একবার সেখেনে পৌঁছোলে সে নিজেই আমাকে ধরে নামিয়ে নেবে।

আমি ইষ্টনাম জপ করতে শুরু করলুম। আপত্তির সব কারণগুলো বলতে হলে অনেক ইংরেজি বলতে হয়, আবার যদি শুধু 'নো' বলি তো ভাববে কাওয়ার্ড—তাতে বাঙালির বদনাম হয়। তাই চোখ বুজে অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে বলে দিলুম—ইয়েস, ভেরি গুড।

তিন মিনিটের মধ্যে টার্জানের খেল দেখিয়ে ক্যাবলা কাঠের বাড়ির ছাদে পৌঁছে গেল। তারপর লতাটাকে ছেড়ে দিতেই সেটা আবার সাঁই করে দুলে ফিরে এল, আর আমিও সেটাকে খপ করে ধরে নিয়ে গাছে চড়তে শুরু করলুম। কীভাবে চড়িচি সে আর বলে কাজ নেই ; হাঁটুর আর কনুইয়ের অবস্থা তো আপনি নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন।

ডালের উপর পৌঁছে লতাটাকে নিজের কোমরের চারপাশটায় বেশ করে পেঁচিয়ে নিলুম। তারপর দুগগা বলে চোখ কান বুজে ডাল থেকে দিলুম ঝাঁপ। একটা যেন প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া, আর তার সঙ্গে কানের মধ্যে সনসন, পেটের মধ্যে গুড়গুড়, আর হাত পা যেন ঝিমঝিম—কিন্তু পরক্ষণেই দেখলুম আমি একেবারে ক্যাবলার খপ্পরে। সে আমাকে জাপটে ধরে আমার কোমর থেকে লতার প্যাঁচ খুলে দিলে, আর আমিও হাঁপ ছাড়লুম। ঠাকুরমার

দেওয়া অবিনাশ নামটা যে কত সার্থক সেটাও তখনই বুঝলুম।

এবার ক্যাবলা ইশারা করে ছাদের মধ্যিখানে একটা উঁচু মতো চৌখুপির দিকে দেখালে। বুঝলুম সেটা একটা স্কাইলাইট—যেমন আমাদের গিরিডিতে রাইটসাহেবের বাংলোর উপরে রয়েচে। এবার দুজনে হামাগুড়ি দিয়ে সেই স্কাইলাইটের কাছে গিয়ে তার দুটো জানালার মধ্যে দিয়ে মাথা গলিয়ে দিলুম। যা দেখলুম সে এক আশ্চর্য ব্যাপার।

যে ঘরটা দেখা গেল সেটা মাঝের ঘর—আর মনে হল বেশ বড়। যে অংশটা দেখলুম তাতে একটা বেশ বড় কাঠের টেবিল রাখা রয়েচে। সেই টেবিলের উপর আপনি আর গ্রেগরি সাহেব চিত হয়ে শুয়ে আছেন—দুজনেরই মাথায় আটকানো সেই চকচকে বাটি। আপনাদের দুজনেরই চোখ খোলা, আর সেই চোখ স্কাইলাইটের দিকেই চাওয়া—কিন্তু সে চোখে কোনও দৃষ্টি নেই, একেবারে কাচের চোখের মতো চোখ।

টেবিলের পাশে একটি সাহেব পায়চারি করছেন আর কথা বলছেন। উপর থেকে সাহেবের মাথার টাক আর তার পিছন দিকের লম্বা চুলটাই দেখতে পাচ্ছিলুম, কিন্তু গোরিলাদের দাপাদাপির জন্য তার একটি কথাও শুনতে পাচ্ছিলুম না।

ক্যাবলা বললে, 'চলো, নীচে নেমে বাড়ির ভেতরে ঢোকার একটা রাস্তা করা যাক।'

ছোকরা ভারী তৎপর—যেমন কথা তেমনি কাজ। ছাতের পাশ দিয়ে একটা কাঠের খুঁটি ধরে ঠিক বাঁদরের মতো নিঃশব্দে নীচে নেমে গেল। তারপর দেখি হাতছানি দিয়ে ডাকছে আমায়—আমাকেও নাকি ওই ভাবেই নামতে হবে! ভাবুন তো এই বয়সে এসব ডানপিটেমো কি চলে! ছোকরা বোধ হয় আমার কিন্তু কিন্তু ভাব বুঝতে পারলে। সে ইশারায় বোঝালে—তুমি লাফ মারো, আমি তোমায় ধরব। চোখ বুজে মারলুম লাফ। বললে বিশ্বাস করবেন না—ক্যাবলা আমায় ঠিক ফুটবলের মতো লুফে নিলে। কী শক্তি ভাবুন তো!

বাড়ির যেদিকটায় নামলুম সেটা হল পেছন দিক। একটা খোলা জানালা ছিল মাটি থেকে হাতচারেক উঁচুতে। সেটা বেয়ে সাবধানে ভেতরে ঢুকলুম। এ ঘরটা ছোট, বোধ হয় ভাঁড়ারঘর। কাঠের তাক রয়েছে, তাতে টিনের কৌটোতে খাবারটাবার রয়েছে। সামনে ক্যাবলা, আমি ঠিক তার পিছনে পা টিপে টিপে একটা দরজা দিয়ে আরেকটা ঘরে ঢুকলুম। আসতেই তার পাশের ঘর থেকে সাহেবের গলা পেলুম। মনে হল সাহেবের বেশ উল্লাস হয়েছে। ভেজানো দরজার চেরা ফাঁকে চোখ লাগিয়ে বুঝলুম এটাই সেই মাঝের বড় ঘর যাতে আপনারা দুজনে বন্দি হয়ে রয়েছেন। ম্যাসিংহ্যামসাহেব কথা বলে চলেছেন, আর মাঝে মাঝে অট্টহাসি করে উঠছেন। তার কথা শুনে মোটমাট যা বুঝলুম তা হচ্ছে এই—

ম্যাসিংহ্যামের তৈরি ওই বৈদ্যুতিক বাটির গুণ হল এই যে, মানুষ বা মানুষের পূর্বপুরুষ বাঁদর জাতীয় যে কোনও প্রাণী ওই বাটিটি মাথায় পরলেই তাকে ম্যাসিংহ্যামের বশ্যতা স্বীকার করতে হবে। প্রথমে একটি গোরিলাকে ম্যাসিংহ্যাম এইভাবে বশ করে। তারপর সেই গোরিলার সাহায্যে অন্য গোরিলাদের দলে টানে। এই গোরিলাগুলো হয়ে পড়ে তার বিশ্বস্ত চাকর। শুধু চাকর নয়—তার সৈন্য এবং তার বডিগার্ডও বটে। গ্রেগরি সাহেব তাঁর কাজের ব্যাঘাত করছিলেন বলে তিনি গোরিলার সাহায্যে তাঁকে পাকড়াও করেন, এবং মাথায় বাটি পরিয়ে তাকে বশ করেন। আর আপনি তো নিজে থেকেই বশ হয়ে তাঁর কাছে গেছেন। ম্যাসিংহ্যাম আপনাদের মতো দুজন সেরা বৈজ্ঞানিককে হাত করে গোরিলাবাহিনীর সাহায্যে বৈজ্ঞানিক জগতের একেবারে একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসবেন ভাবছিলেন। আপনারা তিনজনে কাজ চালিয়ে যাবেন, এবং যদি বাইরের লোক কেউ নাক গলাতে আসে, তা হলে গোরিলা লেলিয়ে দিয়ে তার দফারফা করা হবে।

ম্যাসিংহ্যামের প্রলাপ শুনে আমরা একেবারে হকচকিয়ে গেলুম। ক্যাবলা রাগে ফুলতে

www.BDeBooks.Com

ফুলতে বললে, 'আড়ি পেতে কোনও লাভ নেই। চলো ঘরের ভিতর ঢুকি।'

আমি কিন্তু আরেকটা জিনিস লক্ষ করেছিলুম যেটা ক্যাবলার চোখে পড়েনি। আমাদের ডানদিকে একটা দরজা রয়েছে, তার মধ্যে দিয়ে আরেকটা ঘর দেখা যাচ্ছে। আমি দরজাটার দিকে গিয়ে সেটা ফাঁক করতেই ভিতরের সব যন্ত্রপাতি চোখে পড়ল। বুঝতে পারছিলুম, আমার সাহস ক্রমেই বেড়ে চলেছে। দরজাটার মুখে দাঁড়িয়ে ক্যাবলাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলুম। তারপর দরজাটা আরও খানিকটা ফাঁক করলুম। বুঝলুম সেটাই যাকে বলে কন্ট্রোলরুম! দেয়ালের গায়ে কাঠের তক্তার উপর নানারকম বোতাম হ্যান্ডেল সুইচ ইত্যাদি রয়েছে, আর প্রত্যেকটার উপর ইংরিজিতে লেখা রয়েছে কোনটা কী কাজ করে। বুঝলুম এখান থেকেই বোতাম টিপে, মানুষ গোরিলা ইত্যাদি যে কেউ ম্যাসিংহ্যামের বশ, তাদের সবাইকেই চালানো যায়। সেদিন যে বাটির ভিতর থেকে শব্দ বেরোচ্ছিল, তাও সে এখান থেকে বোতাম টেপার জন্যই।

ক্যাবলা দেখি এগিয়ে এসে দরজাটা আরও খানিকটা ফাঁক করলে। তারপর আমার দিকে ফিরে ফিসফিস করে বললে—ভেতরে এসো।

ঢুকতে যাব—কিন্তু বাধা পড়ল। ক্যাবলা পিছিয়ে বাইরে চলে এল। একটু গলা বাড়াতেই দেখি দরজার ঠিক পাশেই একটা বিশাল কালো লোমশ পিঠ দেখা যাচ্ছে। বুঝলুম কন্ট্রোলরুম পাহারা দেবার জন্যেও একটি গোরিলা প্রহরী রাখা হয়েছে।

এবারে বোর্ডের একটি লেখা চোখে পড়ল—'মাস্টার কন্ট্রোল'। লেখার নীচে দুটি সুইচ। একটিতে লেখা 'অন', আর একটিতে 'অফ'। অন সুইচে এখন বাতি জ্বলে রয়েছে। বুঝলুম অন্যটি যদি টেপা যায়, তা হলে সব বৈদ্যুতিক কাজ বন্ধ হয়ে যাবে—গোরিলাগুলো আবার স্বাধীন হয়ে যাবে, আর আপনারাও দুজনে জ্ঞান ফিরে পাবেন। কিন্তু সুইচ টিপব কী করে? ওই কালদানবের দৃষ্টি এড়ানো যে অসম্ভব। আর শুধু তাই নয়—গোরিলাগুলো স্বাধীন ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেলে আবার কী করে বসে তাও তো বলা যায় না। তারা যদি এসে আমাদের আক্রমণ করে তখন কী হবে?

হঠাৎ খেয়াল হল যে পাশের বড় ঘর থেকে আর ম্যাসিংহ্যামের গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি না। ব্যাপার কী?

আবার সেই ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গেলুম। এবার উঁকি মেরে দেখি ম্যাসিংহ্যাম আমাদের দিকে পিঠ করে টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বসে আছে। একটা ধুপধুপ করে শব্দ হল। দেখি একটা গোরিলা একটা প্লেটে করে মাংসজাতীয় কী একটা খাবার এনে ম্যাসিংহ্যামের সামনে রাখলে। স্পষ্ট শুনলুম সাহেব বললে 'থ্যাঙ্ক ইউ'। গোরিলাটা যেদিক দিয়ে এসেছিল আবার সেই দিকেই চলে গেল।

সবে ভাবছি এ অবস্থায় কী করা উচিত, এমন সময় ক্যাবলা চক্ষের নিমেষে এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল! বিদ্যুদ্বেগে দরজাটা খুলে এক লাফে ম্যাসিংহ্যামের পিছনে পৌঁছে ধাঁ করে পকেট থেকে একটা সবুজ রুমাল বার করে সাহেবের মুখটা বেঁধে দিয়ে তার চিৎকারের পথটা বন্ধ করে দিলে। তারপর তাকে জাপটে ধরে চেয়ার থেকে কোলপাঁজা করে তুলে একেবারে আমাদের ঘরে নিয়ে এল।

এবার সাহেবের মুখ দেখলুম। ঘন পাকা ভুরুর নীচে নীল চোখে উন্মাদের দৃষ্টি। অসহায় অবস্থায় পড়ে সেই চোখ দিয়ে যেন আগুন ছুটছে। বুদ্ধি থাকতে পারে সাহেবের, কিন্তু গায়ের জোরে ক্যাবলার কাছে সে একেবারে নেংটিইঁদুর।

এবার ক্যাবলা সাহেবকে কন্ট্রোলরুমের সামনে নিয়ে এসে ফিসফিস করে বললে, 'সুইচ টেপো'। বলেই কন্ট্রোলরুমের দরজা পা দিয়ে ঠেলে খুলে দিলে। কালদানব দাঁড়িয়ে

আছে—এমন বীভৎস, ভয়াবহ জানোয়ার জীবনে দেখিনি মশাই। আমাদের পুরাণের অসুর বোধ হয় ওই জাতীয়ই একটা কিছু ছিল। অবাক হয়ে দেখলুম—গোরিলাটা ম্যাসিংহ্যামকে ওইরকম বন্দি অবস্থায় দেখেও আর কিচ্ছু না করে কেবল একটা কুর্নিশ করলে।

ক্যাবলা আবার বললে, 'সুইচ টেপো।'

ম্যাসিংহ্যাম ক্যাবলার দিকে চেয়ে ঘাড় নেড়ে প্রশ্ন বোঝালে—'কোন সুইচ?'

ক্যাবলা চাপা গম্ভীর স্বরে বললে—'দ্য সুইচ টু সেন্ড দেম ব্যাক।'

ম্যাসিংহ্যামের অবস্থা তখন এমন শোচনীয় যে নৃশংস উন্মাদ হওয়া সত্ত্বেও তখন তার জন্যে একটু মায়া হচ্ছিল।

ক্যাবলা সাহেবের ডান হাতটা একটু আলগা করে দিয়ে তাকে সুইচবোর্ডের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল। সাহেব কাঁপতে কাঁপতে একটা হলদে রঙের বোতাম তার ডান হাতের তর্জনী দিয়ে টিপে দিলে, আর দিয়েই, কেমন জানি অসহায় ভাবে ক্যাবলার বুকের উপর চিত হয়ে পড়লে। সঙ্গে সঙ্গেই প্রথমে ম্যাজিকের মতো বাইরের দুপদাপ শব্দ সব একসঙ্গে থেমে গিয়ে একটা অস্বাভাবিক থমথমে ভাবের সৃষ্টি হল। পাশে চেয়ে দেখি অতিকায় দানবের চোখের দৃষ্টি একেবারে বদলে গেছে। সে এদিক ওদিক চাইছে—নাক দিয়ে ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছে।

এদিকে ক্যাবলা কিন্তু তখনও ম্যাসিংহ্যামকে জাপটে ধরে আছে, আর ম্যাসিংহ্যামের দৃষ্টি রয়েছে গোরিলার দিকে। ক্যাবলা আমায় ফিসফিস করে বললে, 'কাঁধ থেকে আমার বন্দুকটাও নাও—নিয়ে পিছিয়ে গিয়ে গোরিলাটার দিকে তাগ করে থাকো—ইফ হি ডাজ এনিথিং, প্রেস দ্য ট্রিগার!'

সার্কাসের খেলাই যখন দেখালুম, তখন শিকারির খেলা দেখাতে আর কী? গম্ভীরভাবে ক্যাবলার হাত থেকে বন্দুকটা খুলে নিয়ে দশ হাত পিছিয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে দাঁড়ালুম। তারপর বন্দুকটা উচিয়ে গোরিলাটার দিকে তাগ করলুম।

জন্তুটা প্রথমে কন্ট্রোলরুম থেকে বেরিয়ে এল। তারপর এদিকে ওদিকে চেয়ে মুখ দিয়ে একটা ঘরঘর শব্দ করে দাঁত খিঁচিয়ে দুহাত দিয়ে তার নিজের বুকের উপর দুমদুম করে কয়েকটা কিল মারল। তারপর—আশ্চর্য ব্যাপার—কাউকে কিছু না বলে চার পায়ে ভর করে নিঃশব্দে দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাইরে চলে গেল।

এবার বড় ঘরে গেলুম। আপনারা দুজনে তখনও যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাব করে টেবিলের উপর শুয়ে আছেন। একটা প্রচণ্ড দাপাদাপির শব্দ পেয়ে বাঁ দিকে ঘুরে জানালা দিয়ে দেখি বাইরে এক অদ্ভুত কাণ্ড চলেছে। কতগুলো গোরিলা জানি না—অন্তত শ পাঁচেক তো হবেই—সবকটা একসঙ্গে নিজেদের বুকে কিল মারছে। দুমদুম ধুপধুপ দুমদুম—হাজার দুরমুশের শব্দে কান পাতা যায় না।

তারপর ক্রমে শব্দ থেমে এল, আর দেখলুম কী—সব কটা গোরিলা একসঙ্গে পুবমুখো হয়ে কম্পাউন্ডের গেটের দিকে চলতে শুরু করল। আপনার ও গ্রেগরিসাহেবের মাথা থেকে যন্ত্রদুটো যখন খুলছি, ততক্ষণে গোরিলাদের পায়ের শব্দ প্রায় মিলিয়ে এসেছে।

তার পরের ঘটনা আর কী বলব। ম্যাসিংহ্যাম সাহেবকে যে পাগলাগারদে রাখা হয়েছে সে খবর তো জানেন। আর গোরিলাদের হাতের তৈরি তার কাঠের বাড়িটিকে যে যন্ত্রপাতি সমেত পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলা হয়েছে তাও জানেন। এখন শুধু এইটেই বলার আছে যে, ভবিষ্যতে কোথাও কোনও হ্যাঙ্গামের কাজে যেতে হলে আমাকে বাদ দিয়ে যাওয়াটা নিরাপদ হবে কি না, সেটা ভেবে দেখবেন!

www.BDeBooks.Com

প্রোফেসর শঙ্কু ও বাগ্‌দাদের বাক্স

১৯শে নভেম্বর

গোল্ডস্টাইন এইমাত্র পোস্টআপিসে গেল কী একটা জরুরি চিঠি ডাকে দিতে। এই ফাঁকে ডায়রিটা লিখে রাখি। ও থাকলেই এত বকবক করে যে তখন ওর কথা শোনা ছাড়া আর কোনও কাজ করা যায় না। অবিশ্যি প্রোফেসর পেত্রুচিও আমার সঙ্গেই রয়েছে, আমার সামনেই বসে, কিন্তু কাল হোটেলে তার হিয়ারিং এডটা হারিয়ে যাবার ফলে সে শব্দটব্দ বিশেষ শুনতে পাচ্ছে না। ফলে লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা একরকম বন্ধই করে দিয়েছে। এদেশের ভাষাটা তার বেশ ভাল ভাবেই জানা আছে, এবং আপাতত সে একটি স্থানীয় খবরের কাগজ মুখের সামনে খুলে বসে আছে।

আমাদের বসার জায়গাটা হল বাগ্‌দাদ শহরের একটা রেস্টোরান্ট। দোকানের বাইরে ফুটপাথের উপর ফরাসি কায়দায় চাঁদোয়া টাঙিয়ে তার তলায় টেবিলচেয়ার পাতা, এবং তারই একটাতে আমরা বসেছি। কফি অর্ডার দেওয়া হয়েছে, এই এল বলে।

বাগ্‌দাদে আসার কারণ হল—আন্তর্জাতিক আবিষ্কারক সম্মেলন, অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল ইন্‌ভেন্টরস কনফারেন্স। বৈজ্ঞানিক সম্মেলন বহুকাল থেকেই পৃথিবীর নানান জায়গায় হয়ে আসছে, কিন্তু আবিষ্কারক সম্মেলন এই প্রথম। বলা বাহুল্য এখানে যাঁরা আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে আমার স্থান খুবই উঁচুতে। পৃথিবীর কোনও একজন বৈজ্ঞানিক এর আগে আর কখনও এতরকম জিনিস আবিষ্কার করেনি। যাঁরা এসেছেন, তাঁরা সকলেই তাঁদের লেটেস্ট ইনভেনশনটি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, এবং এই সম্মেলনের একটা প্রধান উদ্দেশ্য হল এইসব আবিষ্কারের খবর পৃথিবীতে প্রচার করা। আমি এনেছি আমার 'অম্‌নিস্কোপ' যন্ত্র। এটা বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছে। যন্ত্রটা হল একরকম চশমা যাতে টেলিস্কোপ, মাইক্রোস্কোপ ও একস্‌-রে—এই তিনটে জিনিসেরই কাজ চলে।

কন্‌ফারেন্স কাল শেষ হয়ে গেছে। বাইরে থেকে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ সকালে যে যার দেশে ফিরে গেছেন। আমরা তিনজন আপাতত আরও কিছুদিন থাকব। আমি প্রথম থেকেই ঠিক করেছিলাম হপ্তাখানেক থেকে যাব। সঙ্গে যে আরও দুজনকে পেয়ে গেলাম সেটা কপালজোরে। আমি নিজে কাউকে কিছুই বলিনি। কাল রাত্রে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিনার ছিল, খাওয়া সেরে হোটেলে ফেরার পথে গোল্ডস্টাইন জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি কালই ফিরে যাচ্ছ নাকি ?' আমি বললাম, 'হারুণ-অল্‌-রশিদের দেশে মাত্র সাতদিন থেকে ফিরে যাবার ইচ্ছে নেই। ভাবছি দেশটাকে আরেকটু ঘুরে দেখব। এখানকার প্রাচীন সভ্যতার কিছু নমুনা চাক্ষুষ দেখে তারপর দেশে ফিরব।'

গোল্ডস্টাইন উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'যাক, তা হলে একজন সঙ্গী পাওয়া গেল। আর শুধু হারুণ-অল্‌-রশিদের দেশ বলছ কেন ? হারুণ তো মাত্র হাজার বছর আগের কথা। তার আগের কথাও ভাবো !'

আমি বললাম, 'ঠিক কথা ! আমরা ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা নিয়ে গর্ব করি, কিন্তু এ যে

তার চেয়েও অনেক পুরনো। সুমেরীয় সভ্যতার যেসব চিহ্ন মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে, সে তো আজ থেকে প্রায় সাত হাজার বছর আগেকার ব্যাপার। ঈজিপ্টেও এতদিনের সভ্যতার কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি।'

গোল্ডস্টাইন বলল, 'আবিষ্কারক সম্মেলন এদেশে হবার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে সেটা খেয়াল করেছ নিশ্চয়। এদেশে প্রথম লেখার আবিষ্কার হয় প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে, আর এই লেখা থেকেই সভ্যতার শুরু।'

প্রাচীনকালে যাকে মেসোপটেমিয়া বলা হত, তারই অন্তর্গত ছিল ইরাক। মেসোপটেমিয়া টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর ধারে। এখন যেখানে বাগদাদ শহর, তারই আশেপাশে পৃথিবীর প্রথম সভ্য মানুষ দেখা দেয়। এই সভ্যতার নাম সুমেরীয় সভ্যতা। পাথরের গায়ে খোদাই করা পৃথিবীর আদিমতম লেখার অনেক নমুনা প্রত্নতাত্ত্বিকরা বাগদাদের আশেপাশেই আবিষ্কার করেছেন। শুধু তাই নয়, বৈজ্ঞানিকদের পরিশ্রমের ফলে এই সব লেখার মানে বার করাও সম্ভব হয়েছে।

এই প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে অনেক উত্থান পতন লক্ষ করা যায়। আজ থেকে চার হাজার বছর আগে সুমেরীয়দের আক্রমণ করে সেমাইট জাত। যুদ্ধে সুমেরীয়দের পরাজয় হয়। এর পরের ইতিহাসে আমরা ব্যাবিলন ও অ্যাসিরিয়ার উত্থানের কথা জানতে পারি। আর তার সঙ্গে সঙ্গে পাই জাঁদরেল সব রাজাদের উল্লেখ—নেবুচাদনেজার, বেলসাজার, সেনাচেরিব, আসুরবানিপাল। এদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন মহৎ ও উদারচেতা, আবার কেউ কেউ ছিলেন দুর্বৃত্ত, অত্যাচারী।

তখনকার দিনেও ব্যাবিলন শহরের সবচেয়ে বড় প্রাসাদের উচ্চতা ছিল প্রায় ১০০ ফুট। প্রাসাদে প্রাসাদে শহর এমন ছেয়ে ছিল যে দূর থেকে দেখে মনে হত যেন দেবপুরী। রাত্রেও এ শহরের শোভা কিছুমাত্র কমত না, কারণ দু হাজার বছর আগেই ব্যাবিলনিয়রা তাদের মাটি থেকে পেট্রোলিয়াম আহরণ করে তাকে কাজে লাগাতে শিখে গিয়েছিল। পেট্রোলিয়ামের আলোয় গভীর রাতেও সারা শহর ঝলমল করত।

আড়াই হাজার বছর আগে পারস্যসেনা এসে ব্যাবিলন আক্রমণ করে, এবং সেমাইটদের পরাজিত করে। এই পারস্যদের মধ্যেও আশ্চর্য পরাক্রমশালী রাজাদের নাম আমরা পাই—দারিয়ুস, সাইরাস, জেরক্সেস—কেউ মহৎ, আবার কেউ বা প্রচণ্ড ভাবে নৃশংস। এইসময়ই পারস্যদের অন্তর্গত একটা ভবঘুরে জাত বেলুচিস্তানের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছোয়। এদেরই বলা হয় এরিয়ান বা আর্য। আসলে এরিয়ান ও ইরানীয়তে কোনও তফাত নেই।

এইসব কারণে এ দেশটার সঙ্গে আমাদের ভারতীয়দের যে একটা বিশেষ আত্মীয়তা আছে সেটা তো অস্বীকার করা যায় না। আর ভারতবর্ষে ক'টা শিক্ষিত লোক আছে যারা আরব্যোপন্যাস পড়ে মুগ্ধ হয়নি? আর হারুণ-অল্-রশিদের বাগদাদের যে বর্ণনা আমরা আরব্যোপন্যাসে পাই, তাতে বেশ বোঝা যায় সে সময় বাগদাদ একটা গমগমে শহর ছিল। আজকের শহরের সঙ্গে গল্পের সে শহরের বিশেষ মিল নাও থাকতে পারে, কিন্তু যাদের কল্পনাশক্তি আছে, তারা এখানে এসে সেইসব গল্পের কথা মনে করে একটা রোমাঞ্চ অনুভব না করে পারে না।

গোল্ডস্টাইন ফিরছে। সঙ্গে একটা অচেনা বৃদ্ধকে দেখতে পাচ্ছি। স্থানীয় লোক বলেই তো মনে হচ্ছে। পরনে কালো সুট, কিন্তু মাথায় লাল ফেজ টুপি। এ আবার কার আবির্ভাব হল কে জানে।

www.BDeBooks.Com

১৯শে নভেম্বর, রাত ১১টা

আমার এই পঁয়ষট্টি বছরের জীবনে কতরকম অদ্ভুত লোকের সঙ্গে যে আলাপ হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এইসব লোক সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। যদিও এদের অনেকের সঙ্গেই একবারের বেশি দেখা হয়নি। তবুও এদের কারোর কথাই কোনওদিনও ভুলতে পারব না।

এইরকম একজন অদ্ভুত লোকের সঙ্গে আজ সকালে আলাপ হল। একেই গোল্ডস্টাইন সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। ভদ্রলোক ইরাকি, নাম হাসান অল্ হাব্বাল। বয়স আমার চেয়েও হয়তো কিছুটা বেশি, কিন্তু চলাফেরা রীতিমতো চটপটে আর চোখের চাহনিও আশ্চর্য রকম তীক্ষ্ণ।

গোল্ডস্টাইন আলাপ করিয়ে দিতে ভদ্রলোক হাসিমুখে কুর্নিশ করে পাশের চেয়ারে বসে আমার দিকে চেয়ে বললে, 'আমার জীবনে আপনিই প্রথম ভারতীয় যার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হল। এ আমার পরম সৌভাগ্য, কারণ ভারতবর্ষের সঙ্গে আমাদের যে ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে, সে কথা আমি কখনও ভুলিনি।'

আমি একটা উপযুক্ত মোলায়েম উত্তর দিয়ে মনে মনে ভাবছি গোল্ডস্টাইন হঠাৎ একে আমাদের মধ্যে এনে হাজির করল কেন, এমন সময় ভদ্রলোক নিজেই এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেলল। সে বললে, 'সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকরা আমাদের এই বাগদাদ শহরে এসেছেন জেনে আমার খুবই আনন্দ হচ্ছিল। আপনাদের ছবি কাগজে দেখেছিলাম, ইচ্ছে ছিল আলাপ করি, কিন্তু কীভাবে করব বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ পোস্টআপিসে এঁকে দেখতে পেয়ে আমি নিজেই এগিয়ে গিয়ে আলাপ করি।'

ওয়েটারকে ডেকে আরেক কাপ কফির জন্যে বলে দিলাম, কারণ ভদ্রলোক যেভাবে বসেছে, তাতে তার যাবার খুব তাড়া আছে বলে মনে হল না। দুহাতের আঙুলে আংটির নমুনা দেখে মনে হচ্ছিল লোকটি বেশ অর্থবান। পোশাকেও সে ইঙ্গিত রয়েছে।

একটা সোনার কেস খুলে কালো রঙের সিগারেট প্রথমে আমাদের অফার করে, তারপর নিজে ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে ভদ্রলোক বলল, 'আপনাদের যে প্রশ্নটা করার ইচ্ছে ছিল সেটা হচ্ছে এই—আপনারা সব বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক, কিন্তু আমাদের দেশে কতরকম জিনিস যে হাজার হাজার বছর আগেই আবিষ্কার হয়ে গেছে সেটা কি আপনারা জানেন?'

উত্তরে আমি বললাম, 'তা—প্রত্নতাত্ত্বিকদের দৌলতে কিছু কিছু জানতে পেরেছি বই কী। ধরুন, আপনাদের প্রাচীন লেখা, প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্র, আপনাদের চার হাজার বছর আগের পেট্রোলিয়াম বাতি, আপনাদের—'

অল্ হাব্বাল হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠে আমার কথা থামিয়ে দিয়ে বলল, 'জানি জানি জানি—এ সবই বইয়ে লেখে সাহেবরা—প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসের বই! আমি জানি। আমি পড়েছি। কিন্তু এ তো কিছুই না!'

'কিছুই না?' আমি আর গোল্ডস্টাইন সমস্বরে বলে উঠলাম। পেত্রুচি দেখি হাতের কাগজ ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে উঠে বসে অল্ হাব্বালের ঠোঁটের দিকে চেয়ে আছে; বোধ হয় তার ঠোঁট নড়া দেখেই কথাগুলো বুঝে ফেলতে চায়।

অল্ হাব্বাল একবার চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'রেস্টোরান্টে বড় ভিড়, আর রাস্তার গোলমালে গলা নামিয়ে যে কথা বলব তারও উপায় নেই। আপনাদের কফি খাওয়া হয়ে থাকলে চলুন নিরিবিলি কোথাও যাই।'

গোল্ডস্টাইন ওয়েটারকে ডেকে পয়সা দিয়ে দিল। আমরা চারজনে উঠে নদীমুখো হাঁটতে শুরু করলাম।

টাইগ্রিস নদীর পাশ দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত একটা চমৎকার বাঁধানো রাস্তা চলে গেছে, তার একপাশটায় পাম জাতীয় গাছের সারি। সেই গাছের ছায়া দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অল্ হাব্বাল তার বাকি কথাগুলি বলল।

ভদ্রলোক প্রথমেই জিজ্ঞেস করলে, 'তোমরা আরব্যোপন্যাস পড়েছ তো?'

আমি বললাম, 'সে আর কে পড়েনি বলো। এমন গল্পের সম্ভার ভারতবর্ষের বাইরে এক তোমাদের দেশেই আছে। ছেলেবুড়ো সবাই এ গল্প জানে। অন্তত কয়েকটি তো জানেই।'

www.BDeBooks.Com

অল্ হাব্বাল মৃদু হেসে বলল, 'কী মনে হয় গল্পগুলো পড়ে ?'

আমি বললাম, 'মানুষের কল্পনাশক্তি যে কত মজার ও কত রংদার কাহিনী সৃষ্টি করতে পারে, সেটা এসব গল্প পড়লে বোঝা যায়।'

অল্ হাব্বাল আবার সেই অদ্ভুত খিলখিল হাসি হেসে বলল, 'কল্পনা ?—তাই, না ? সকলেই তাই ভাবে। কল্পনা ছাড়া আর কী হবে—এমন অদ্ভুত সব ব্যাপার কি আর বাস্তবে ঘটতে পারে। অথচ তোমরা যে এখানে কন্‌ফারেন্স করলে, তোমরা সকলেই একটা করে নিজেদের আবিষ্কৃত জিনিস নিয়ে এসেছ, তার মধ্যে অনেকগুলি ভারী অদ্ভুত—একেবারে তাক লেগে যাবার মতো। কিন্তু কই—সেগুলোকে তো কেউ কল্পনা বলছে না। যেহেতু চোখে দেখছে, সেহেতু সেটা বাস্তব বলে মেনে নিচ্ছে। তাই নয় কি ?'

আমি আর গোল্ডস্টাইন পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। নদী দিয়ে একটা বাহারের পালতোলা নৌকো যাচ্ছে—চট করে দেশের কথা মনে পড়ে গেল। অল্ হাব্বাল বলল, 'চলো—ওই বেঞ্চিটায় বসা যাক।'

ঘড়িতে দেখি সাড়ে এগারোটা।

লোকটা হয়তো ছিটগ্রস্ত। সন্দেহটা কিছুক্ষণ থেকেই আমার মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে। নাহলে ওরকম অদ্ভুতভাবে হাসে কেন ?

বেঞ্চিতে বসে আরেকটা কালো সিগারেট ধরিয়ে অল্ হাব্বাল বলল, 'তোমরা যদি প্রতিজ্ঞা কর যে আমি যা দেখাব তা তোমরা কোথাও প্রচার করবে না, আর আমার দেখানো কোনও জিনিস তোমরা নিতে চাইবে না—'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'কী আশ্চর্য কথা ! তোমার জিনিস আমরা চাইব কেন ?'

অল্ হাব্বাল ক্রূর হাসি হেসে বলল, 'তোমার কথা বলছি না, কিন্তু'—এবারে তার দৃষ্টি গোল্ডস্টাইনের দিকে—'পশ্চিমের অনেক জাদুঘরেই তো আমাদের দেশের অনেক ভাল জিনিসই চলে গেছে কিনা ! বেশির ভাগই তো বাইরে, তাই ভয় হয় নিজের জন্য না চাইলেও, যদি জাদুঘরের লোক লেলিয়ে দাও !'

গোল্ডস্টাইন কোনওরকমে তার অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে বেশ জোরের সঙ্গেই বলল, 'না না—তা কেন করব ! কথা দিচ্ছি, তোমার জিনিসের কথা কাউকে বলব না। কিন্তু জিনিসটা কী ?'

আমি মনে মনে জানতাম, জাদুঘরের লোক লেলিয়ে না দিলেও জিনিসটা যদি তেমন লোভনীয় হয়, তা হলে গোল্ডস্টাইন হয়তো নিজেই সেটার উপর চোখ দিতে পারে। কারণ প্রথমত, ভদ্রলোক প্রচুর পয়সাওয়ালা মার্কিন ইহুদি, বিজ্ঞান তার শখের ব্যাপার ; দ্বিতীয়ত, তার আসল বাতিক হচ্ছে পুরনো জিনিস সংগ্রহ করা। বাগ্‌দাদে এসে এই কদিনের মধ্যেই আমার চোখের সামনে সে প্রায় হাজার ডলারের খুঁটিনাটি পুরনো জিনিস কিনে ফেলেছে।

অল্ হাব্বাল এবার অত্যধিক রকম গম্ভীর স্বরে বলল, 'জিনিস একটা নয়—অনেক। খ্রিস্টপূর্ব যুগের সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। এখান থেকে সত্তর মাইল দূরে যেতে হবে। গাড়ির ব্যবস্থা আমি করব। আমার নিজের গাড়ি আছে।'

এর বেশি আর অল্ হাব্বাল বলল না।

কাল সকালে সাড়ে আটটায় ওর গাড়ি নিয়ে আসার কথা আছে। ভদ্রলোককে বিদায় দেবার পর গোল্ডস্টাইন ও পেত্রুচির সঙ্গেও কথা হয়েছে। ওদের দুজনেরই ধারণা অল্ হাব্বাল একটি আস্ত পাগল, যেমন পাগল পৃথিবীর সব শহরেই কয়েকটি করে থাকে। গারদে পাঠানোর অবস্থা এখনও হয়নি, তবে ভবিষ্যতে হবে না একথা জোর দিয়ে বলা চলে না।

সব শুনে আমি বললাম, 'পরের গাড়িতে বিনি পয়সায় যদি বাগদাদের আশপাশটা ঘুরে

দেখা যায় তা হলে মন্দ কী ?'

হোটেলে ফিরে লাঞ্চ খেয়েছি প্রায় দেড়টায়। দুপুরে একটু গড়িয়ে নিয়েছি। এখানকার ক্লাইমেট খুবই ভাল ; শরীরে রীতিমতো শক্তি ও মনে প্রচুর উৎসাহ অনুভব করছি।

২০শে নভেম্বর

বাগদাদের মতো আজব শহরে আজব অভিজ্ঞতা হবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কিন্তু ঠিক এতটা আশা করিনি। রূপকথা কল্পনার জগতের জিনিস। সেটা শুনে বা পড়ে যে আনন্দ পাওয়া যায় সেটা একটা বিশেষ ধরনের আনন্দ। কিন্তু হঠাৎ যদি দেখা যায়, সে রূপকথার অনেক কিছুই বাস্তব জগতে রয়েছে, তা হলে হঠাৎ কেমন জানি সব গণ্ডগোল হয়ে যায়।

এবার আজকের ঘটনায় আসা যাক।

হাসান অল্ হাব্বাল তার কথামতো ঠিক সাড়ে আটটার সময় তার একটি সবুজ সিত্রোঁয় গাড়ি নিয়ে হোটেলে এসে হাজির হল। শুধু গাড়ি নয় গাড়ির ভিতর আবার একটা বেতের বাস্কেট। তার সেই অদ্ভুত হাসি হেসে ভদ্রলোক বলল, 'তোমাদের দুপুরের লাঞ্চটা আমার সঙ্গে রয়েছে। আজ সারাদিনের জন্যে তোমরা আমার অতিথি।'

নটার মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। পেত্রুচি কাল সারা বিকেলে বাগদাদের দোকানে দোকানে ঘুরে একটা কানের যন্ত্র জোগাড় করেছে, তার ফলে আজ তার মুখের ভাবই বদলে গেছে। গোল্ডস্টাইন এমনিতেই আমুদে লোক—গাড়িতে ওঠার সময় বলল—'ছেলেবেলায় দলেবলে গাড়িতে করে পিকনিকে বেরোতাম—সেই কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।'

কথাটা বলেই সে আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপল। বুঝলাম সে অল্ হাব্বালের একটা কথাও বিশ্বাস করেনি। তার অন্য কোনও কাজ নেই বলেই সে আমাদের সঙ্গ নিয়েছে, এবং আউটিং-এর যে আনন্দ, তার বেশি সে কিছুই আশা করছে না।

টাইগ্রিস নদীর উপর একটা ব্রিজ পেরিয়ে আমরা পশ্চিমদিকে চললাম। এদিকটায় গাছপালা বিশেষ নেই—কতকটা শুকনো মরুভূমির মতো। তবে নভেম্বর মাস বলে গরম একদম নেই।

গাড়ি চালাতে চালাতে অল্ হাব্বাল বলল, 'আমরা যে জায়গায় যাচ্ছি সেখানে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যে ব্যবধান মাত্র পঁচিশ মাইল। দুটো নদী এত কাছাকাছি হওয়াটা ব্যাবিলনের সমৃদ্ধির একটা কারণ ছিল।'

একটা প্রশ্ন কাল থেকেই আমার মাথায় ঘুরছিল, এখন আর সেটা না জিজ্ঞেস করে পারলাম না—

'তুমি কি বৈজ্ঞানিক ? মানে, প্রত্নতাত্ত্বিক, বা ওই জাতীয় একটা কিছু ?'

অল্ হাব্বাল বলল, 'বৈজ্ঞানিক বলতে যদি ডিগ্রিধারী বোঝায়, তা হলে আমি বৈজ্ঞানিক নই। আর প্রত্নতাত্ত্বিক বলতে যদি মাটি খুঁড়ে প্রাচীন সভ্যতার নমুনা আবিষ্কার করা বোঝায়, তা হলে আমি অবশ্যই একজন প্রত্নতাত্ত্বিক।'

গাড়ি সমতলভূমি ছেড়ে চড়াই উঠতে আরম্ভ করেছে। দূরে পাহাড়ের শ্রেণী দেখা যাচ্ছে। অল্ হাব্বাল বলল, 'ওই পাহাড়গুলোই ইরাকের সীমানা নির্দেশ করেছে। ওর পিছন দিকে পারশিয়া।'

চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যও ক্রমে বদলাতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের গাড়ি একটা গিরিবর্ত্মে প্রবেশ করল। দুদিকে খাড়াই পাহাড়ের মধ্যে রাস্তা দিয়ে আমরা

www.BDeBooks.Com

চলেছি। বাগদাদে আসবার আগে আমি ইরাক সম্বন্ধে খানিকটা পড়াশুনো করে নিয়েছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'আমরা কি আবু গুয়াইবে এসে পড়েছি ?' অল্ হাব্বাল মাথা নেড়ে বলল, 'ঠিক বলেছ। আর দশ মাইল গেলেই আমরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাব।'

গিরিবর্ত্মের মধ্যে সূর্যের আলো প্রায় পৌঁছোয় না, তাই বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছিল। আমি গলার মাফলারটাকে বেশ ভাল ভাবে জড়িয়ে নিলাম। পেত্রুচি এখনও পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি। লোকটাকে চেনা ভারী মুশকিল। গোল্ডস্টাইনকে দেখে মনে হল তার ঘুমের আমেজ এসেছে।

গিরিবর্ত্ম পেরোতেই দেখি প্রাকৃতিক দৃশ্য আবার বদলে গেছে। কিছু দূরে সবুজ রং দেখে বুঝলাম এদিকটায় গাছপালার অভাব নেই। তারই মাঝে মাঝে আবার ছাই রঙের পাথরের টিলা মাথা উঁচিয়ে রয়েছে।

গাড়ি মেইন রোড থেকে বাঁ দিকে মোড় নিল। অল্ হাব্বাল গুন গুন করে ইরাকি সুর ভাঁজছে—তার সঙ্গে ভারতীয় সুরের আশ্চর্য মিল। কত বয়স হবে লোকটার ? দেখে আন্দাজ করার কোনও উপায় নেই। হাসলে পরে চোখের কোণে অসংখ্য কুঁচকোনো লাইন দেখা দেয়। তাই দেখে এক এক সময় মনে হয় বয়স নব্বইও হতে পারে। অথচ কী আশ্চর্য এনার্জি লোকটার ! ষাট মাইলের উপর গাড়ি চালিয়ে এল—এখনও ক্লান্তির কোনও লক্ষ্মণ নেই।

আরও মিনিট দশেক চলার পর গাড়িটা একটা ঝাউগাছের পাশে এসে থামল। অল্ হাব্বাল বলল, 'বাকি পথটুকু আমাদের হেঁটে যেতে হবে। বেশি না—সিকি মাইল পথ।'

অদ্ভুত নির্জন নিস্তব্ধ পরিবেশ। গাছপালা রয়েছে অনেক—উইলো, ওক, ঝাউ, খেজুর ইত্যাদি—প্রায় বনই বলা যেতে পারে, অথচ তারই ফাঁকে ফাঁকে এক একটা বিরাট পাথরের ঢিবিও রয়েছে। মাঝে মাঝে পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে, তারমধ্যে বুলবুলের ডাকটা শুনে দেশের কথা মনে পড়ে গেল। জায়গায় জায়গায় গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে, আর সে রোদটা গায়ে পড়লে বেশ আরামই লাগছে।

এবার চোখে পড়ল আমাদের সামনেই একটা বেশ বড় পাথরের ঢিপি। অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে ঢিপিটা, আর তার সবচেয়ে উঁচু জায়গাটা প্রায় একটা চারতলা বাড়ির সমান।

টিলাটার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় অল্ হাব্বাল হঠাৎ থেমে বলল, 'এসে গেছি।'

কোথায় এসে গেছি ? বাঁ দিকে ঝাউবন, আর ডান দিকে টিলার খাড়াই অংশ—এ ছাড়া আর কিছুই নেই। এখানে দেখবার কী থাকতে পারে ?

অল্ হাব্বালের দিকে চেয়ে দেখি তার মুখের ভাব একদম বদলে গেছে। তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে, সারা শরীরে কেমন যেন একটা উত্তেজনার ভাব, যার ফলে সে তার হাতদুটোকে স্থির রাখতে পারছে না। হঠাৎ সে তার অদ্ভুত কায়দায় খিল খিল করে হেসে আমাদের তিনজনের উপর তার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে চাপা গলায় বলে উঠল—'তোমরা না সব আবিষ্কারক—ইনভেন্টার্স ? বিংশ শতাব্দীর সব বড় বড় বৈজ্ঞানিক ? বেশ—তা হলে দেখো এবার প্রথম শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের কারসাজি !—চিচিং ফাঁক !'

আমি বাংলায় চিচিং লিখলেও অল্ হাব্বাল অবিশ্যি আরবি 'সিম্ সিম্' শব্দটাই ব্যবহার করেছিল, কিন্তু এই শব্দ উচ্চারণের ফলে যে ঘটনাটা ঘটল সেটা আজকের দিনের মানুষের পক্ষে বিশ্বাস করা খুব কঠিন।

টিলার গায়ে একটা বিরাট আলগা পাথরের অংশ একটা গম্ভীর ঘরঘর গর্জনের সঙ্গে এক

পাশে সরে গিয়ে গহ্বরের ভিতরে যাবার একটা পথ করে দিল। আমরা তিনজন থ হয়ে দাঁড়িয়ে এই অবিশ্বাস্য ঘটনাটা ঘটতে দেখলাম।

অল্ হাব্বাল আমাদের এই অবাক বোকা বনে যাওয়া ভাবটা কয়েক মুহূর্ত উপভোগ করে নিয়ে, কুর্নিশ করে, তার বাঁ হাতটা থিয়েটারি ভঙ্গিতে গহ্বরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আলিবাবার গুহায় প্রবেশ করতে আজ্ঞা হোক!'

আমরা অল্ হাব্বালের পিছন পিছন গুহায় প্রবেশ করলাম। অল্ হাব্বাল এবার বলে উঠল, 'চিচিং বন্ধ!'

সঙ্গে সঙ্গে ঘরঘর শব্দ করে পাথরের ফটক বন্ধ হয়ে গেল, আর এক দুর্ভেদ্য অন্ধকার আমাদের সকলকে ঘিরে চেপে ধরল। অল্ হাব্বালের মতলব কী? সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কেমন জানি একটা ভেলকির গন্ধ পাচ্ছিলাম যেটা আমার মোটেই ভাল লাগছিল না।

এবার একটা দেশলাই জ্বালার শব্দ পেলাম, আর তার পরেই গুহার ভিতরটা একটা ম্লান হলদে আলোয় ভরে উঠল। অল্ হাব্বাল একটা ল্যাম্প জ্বালিয়েছে। ল্যাম্পের আলোতে গুহার ভিতরের চারিদিকে চেয়ে দেখে বুঝতে পারলাম, ছেলেবেলার এক কাল্পনিক ছবি আজ আমার চোখের সামনে বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে। আমরা যার ভিতরে দাঁড়িয়ে আছি, সেটাকে আরব্যোপন্যাসের আলিবাবার গুহা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। গুহার চারিদিকে পাথরের গা কেটে তৈরি করা তাক আর খুপরিতে রয়েছে বিচিত্র জিনিস। বাক্স প্যাঁটরা ঘটি বাটি চেয়ার ফুলদানি কলসি কুঁজো কত রয়েছে তার হিসেব নেই। এর সবই কোনও না কোনও ধাতুর তৈরি। কয়েকটা তো সোনারও হতে পারে বলে মনে হয়। আর প্রত্যেকটা জিনিসের গায়েই নানান রঙের পাথর বসানো—যা থেকে ল্যাম্পের আলো প্রতিফলিত হয়ে গুহার ভিতরটায় একটা অদ্ভুত রং-বেরঙের বর্ণচ্ছটার সৃষ্টি করেছে।

আমরা স্তব্ধ হয়ে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখছি, এমন সময় গোল্ডস্টাইন হঠাৎ তার ভারী গলায় চেঁচিয়ে উঠল—'আমাদের কি কচি খোকা পেয়েছ? বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে বুজরুকি?'

আশ্চর্য, এবারে ধমকানি সত্ত্বেও অল্ হাব্বালের মধ্যে কোনও বিরক্তির ভাব লক্ষ করলাম না। পিদিমের কম্পমান আলোয় দেখলাম সে গোল্ডস্টাইনের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে, আর ধীরে ধীরে মাথা নাড়ছে। তারপর সে বলল, 'পাঁচ হাজার বছর আগের সুমেরিয়ান লেখা তোমরা কেউ পড়তে পার?'

পেত্রুচি বলে উঠল, 'আমি পারি। আমি প্রত্নতাত্ত্বিক ছিলাম। আজ থেকে বারো বছর আগে এই ইরানের মরুভূমিতেই খোঁড়ার কাজ করতে করতে হিটস্ট্রোক হয়ে আমি প্রায় মারা যাই। তারপর থেকে 'ডিগিং' ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু কেন জিজ্ঞেস করছ তুমি?'

অল্ হাব্বাল পিদিমটা গুহার একটা কোণের দিকে নিয়ে গেল। দেখলাম সেখানে প্রায় আমার সমান উঁচু আর হাত দুয়েক চওড়া একটা ছাইরঙের পাথর দাঁড় করানো রয়েছে। তার গায়ে খোদাই করে যেন কী সব লেখা। অল্ হাব্বাল বলল, 'দেখো তো কী লেখা আছে এতে।'

পেত্রুচি হুমড়ি খেয়ে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে নিজের হাতে পিদিম নিয়ে লেখাটা পড়তে শুরু করল। প্রথমে কিছুক্ষণ সে শুধু বিড়বিড় করল তারপর প্রায় দশ মিনিট পরে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এ পাথর কোথায় পেলে? এ তো এখানকার জিনিস নয়।'

অল্ হাব্বাল বলল, 'আগে বলো ওতে কী লেখা আছে।'

পেত্রুচি বলল, 'এতে এই গুহার বর্ণনা আছে, তার অবস্থান বলা আছে, আর তার ফটক খোলার সংকেত আছে। আর বলা আছে—এই গুহার ভিতরে জাদুকরশ্রেষ্ঠ গেমাল নিশাহিরের কবর আছে, আর তার সঙ্গে তার তৈরি একটা আশ্চর্য বাক্সও এখানেই রাখা

www.BDeBooks.Com

আছে।'

'আর কিছু বলেনি ?' অল্ হাব্বালের শান্ত কণ্ঠস্বরে এখন একটা চাপা উত্তেজনার ভাব লক্ষ করলাম।

'হ্যাঁ—আরও আছে।'

'কী ?'

'বলছে, বাক্সটা নাকি জীবন্ত ইতিহাসের কাজ করবে, এবং এই ইতিহাস যে অবিশ্বাস করবে, বা এই বাক্সের যে অনিষ্ট করবে, তার উপর নাকি জিগুরাৎ-এর দেবতার অভিশাপ বর্ষিত হবে।'

অল্ হাব্বাল গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'হুঁ'—আর সঙ্গে সঙ্গে গোল্ডস্টাইন আবার গর্জন করে উঠল, 'ফটক খুলে দাও। বন্ধ গুহায় বেশিক্ষণ থাকা যায় না—এর বায়ু দূষিত ?'

আমার মনে হল গোল্ডস্টাইন একটু বাড়াবাড়ি করছে। অল্ হাব্বাল ওর চিৎকারে কর্ণপাত করল না। পেত্রুচি বলল, 'দেখে মনে হয় এ পাথর কিশ অঞ্চল থেকে এসেছে। কিন্তু এটা তুমি কী করে পেলে সেটা জানার কৌতূহল হচ্ছে।'

অল্ হাব্বালের উত্তর শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। উদ্বেগ বা উত্তেজনার কিছুমাত্র আভাস না দিয়ে সে বলল, 'সাত বছর আগে স্যার জন হলিংওয়ার্থ কিশ অঞ্চলে যে খননের কাজ করতে এসেছিলেন, সে কথা তোমরা নিশ্চয়ই জান। আমি সে দলের সঙ্গে ছিলাম সরকারি দোভাষী হিসেবে। সেবারই এই পাথরটি খুঁড়ে পাওয়া যায়, আর স্যার জন-এর লেখার মানে করার আগেই আমি গোপনে সে-কাজটা সেরে ফেলি। আর তার পরদিনই আমি পাথরটাকে নিয়ে, যাকে বলে সরে পড়ি। এতে আমি কোনও দোষ দেখিনি। এখনও দেখি না। কারণ এ তো আমাদেরই দেশের জিনিস। এ জিনিসটা সাহেবের হাতে পড়লে কি আর বাগদাদে থাকত ? এ চলে যেত হয় ব্রিটিশ মিউজিয়ম না হয় পশ্চিমের অন্য কোনও জাদুঘরে। আমি বরং এটাকে আমাদেরই দেশে রেখে দিয়েছি, এবং এমন একটা নিরাপদ জায়গায় যেখানে এর কোনওদিন কোনও ক্ষতি হতে পারবে না।'

গোল্ডস্টাইন এতক্ষণ একটা পাথরের ঢিবির উপর বসে ছিল, এখন হঠাৎ একেবারে ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে উঠল, 'দুর্বৃত্ত ! ভণ্ড ! জোচ্চোর ! এইসব পাথরের লেখা আর গুহার অন্য সব জিনিসপত্তরের কথা জানি না, কিন্তু ফটক খোলার কারসাজিকে তুমি ৫০০০ বছর আগের বৈজ্ঞানিক কীর্তি বলে পাচার করতে চাও ? তুমি বলতে চাও এর পেছনে কোনও আধুনিক বৈজ্ঞানিক কেরামতি নেই ? এই সব পাথরের ফাটলের মধ্যে বৈদ্যুতিক কলকব্জা লুকোনো নেই ?'

অল্ হাব্বাল ডান হাতটা তুলে গোল্ডস্টাইনকে শান্ত হবার ইঙ্গিত করে বলল, 'আপনি যে ভাবে চেঁচাচ্ছেন, তাতে ভয় হয় যিনি আজ পঞ্চাশ শতাব্দী ধরে এই গুহায় কঙ্কাল অবস্থায় বিশ্রাম করছেন, তিনিও না অস্থির হয়ে ওঠেন। দোহাই মিস্টার গোল্ডস্টাইন—আপনি অতটা উত্তেজিত হবেন না।'

গোল্ডস্টাইন কেমন যেন একটু থতমত খেয়ে চাপাস্বরে বলল, 'কঙ্কাল ?'

অল্ হাব্বাল পিদিমটা আবার তুলে নিয়ে পাথরের ফলকটার পিছন দিকটায় এগিয়ে গেল। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দেখি গুহাটা এখানে একটা চতুষ্কোণ চত্বরের চেহারা নিয়েছে। তার মাঝখানে একটা প্রায় চার হাত গভীর গর্ত। সেই গর্তের ভিতরে পিদিমটা নামাতেই চিত হয়ে শোওয়া একটা কঙ্কাল আর তার পাশে ছড়ানো কিছু পোড়ামাটির হাঁড়িকুড়ি দেখতে পেলাম।

অল্ হাব্বাল কঙ্কালের দিকে তার ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'জাদুকরশ্রেষ্ঠ গেমাল

নিশাহির অল্ হারারিৎ।'

পিদিমের আলোয় দেখলাম গোল্ডস্টাইনের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সে মুখ বিকৃত করে বলে উঠল, 'বাগদাদে এসে এসব বীভৎস তামাশা কেন বরদাস্ত করতে হবে তা আমি বুঝতে পারছি না। তুমি ফটক খুলবে কি না বলো।'

অল্ হাব্বাল শান্ত ভাবে কঙ্কালের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে গোল্ডস্টাইনের দিকে তাকাল।

গোল্ডস্টাইন অল্ হাব্বালের জন্য অপেক্ষা না করেই চিৎকার করে উঠল—

'চিচিং ফাঁক!'

কয়েক মুহূর্ত আমরা স্তব্ধ হয়ে ফটকের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু চিৎকারে কোনও ফল হল না। ফটক যেমন বন্ধ তেমন বন্ধই রইল। গোল্ডস্টাইন এবার রাগে কাঁপতে কাঁপতে অল্ হাব্বালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার টুঁটিটা টিপে ধরল।

'তুমি এক্ষুনি ফটক খুলবে কি না বলো।'

আমি আর পেত্রুচি দুজনে মিলে কোনওমতে গোল্ডস্টাইনকে নিরস্ত করলাম। অল্ হাব্বাল তার গলার স্বর গম্ভীর করে বলল, 'প্রোফেসর গোল্ডস্টাইন—আপনি বৃথা উত্তেজিত হচ্ছেন। মন্ত্রটা একটা বিশেষ সুরে উচ্চারণ না করলে ফটক খুলবে না—আর সে সুর একমাত্র আমারই জানা আছে। গুহা আবিষ্কার করার পর ক্রমাগত বিশ দিন ধরে মন্ত্রটা বার বার আবৃত্তি করে তবে আমি ঠিক সুরটা আবিষ্কার করতে পেরেছি। সুতরাং—'

গোল্ডস্টাইন অধৈর্য ভাবে বলল, 'তা হলে তুমিই বলো। আমি আর এই বন্ধ গুহায় থাকতে পারছি না।'

অল্ হাব্বাল বলল, 'কিন্তু তোমাদের এখানে নিয়ে আসার কারণটা না বলে আমি কী করে ফটক খুলি? তোমরা যদি আমার অনুরোধ রক্ষা না কর?'

'কী অনুরোধ?' আমরা তিনজনে একসঙ্গে জিজ্ঞেস করে উঠলাম।

অল্ হাব্বাল এবার প্রদীপটা নিয়ে গুহার মধ্যিখানটায় এগিয়ে গেল। প্রদীপের আলোয় একটা চৌকোনা পাথরের ঢিবি দেখতে পেলাম। তারপর আরও কাছে যেতে দেখতে পেলাম ঢিবিটার উপর একটা অদ্ভুত দেখতে বাক্স রাখা রয়েছে। বাক্সটা মনে হল তামার, কিন্তু তার উপর সোনা ও রুপোর কাজ করা রয়েছে। আর রয়েছে নানান রঙের নানান সাইজের পাথর বসানো। বাক্স বলছি, কিন্তু সেটাকে যে খোলা যায়, বা তার যে কোনও ঢাকনা বা ডালা বলে কিছু আছে, সেটা দেখে মনে হয় না।

গোল্ডস্টাইন বলল, 'এটা কী?'

পেত্রুচি বলল, 'এই বাক্সটার কথাই কি ওই পাথরে লেখা আছে?'

অল্ হাব্বাল বলল, 'তা ছাড়া আর কী? কারণ এই গুহাটা যখন প্রথম আবিষ্কার করি তখন এর ভিতরে ওই কঙ্কাল আর এই বাক্স ছাড়া আর কিছুই ছিল না।'

www.BDeBooks.Com

আমি বললাম, 'কিন্তু লেখায় যে বলছে এর ভিতরে ইতিহাস জীবন্ত ভাবে রক্ষিত হয়েছে—সে ব্যাপারটা কী ?'

অল্ হাব্বালের মুখে একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠল। বলল—

'সেইটেই তো আসল প্রশ্ন। সেইখানেই তো মুশকিল। আমার বুদ্ধিতে এর রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হচ্ছে না। আমি অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কৃতকার্য হইনি। এবারে বুঝতে পারছ তোমাদের এখানে আনার কারণটা ?'

আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। অবশেষে গোল্ডস্টাইন বলল, 'তুমি চাইছ আমরা এটার রহস্য উদ্ঘাটন করি ?'

অল্ হাব্বাল বলল, 'আমি কাউকে জোর করতে চাই না। সে ইচ্ছা আমার নেই। আমি কেবল অনুরোধ করতে পারি।'

গোল্ডস্টাইন বলল, 'আমি এর মধ্যে নেই সেটা আমি স্পষ্টই বলে দিচ্ছি। আমার বিশ্বাস ওর মধ্যে কিচ্ছু নেই।'

গোল্ডস্টাইন বাক্সটা হাতে তুলে নিল।

অল্ হাব্বাল বাধা দিল না, কেবল গম্ভীর চাপা গলায় বলল, 'ওটার অবমাননা করলে জিগুরাৎ-এর দেবতা অসন্তুষ্ট হবেন।'

গোল্ডস্টাইন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব করে বাক্সটাকে রেখে দিল। এবার আমি সেটাকে অতি সন্তর্পণে হাতে তুলে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলাম, পেত্রুচি আমার পাশে দাঁড়িয়ে।

অল্ হাব্বাল প্রদীপটা নিয়ে আমাদের আরও কাছে এগিয়ে এল।

বাক্সটা ওজনে বেশ ভারী। হাতটা অল্প নাড়া দিতে ভিতর থেকে সামান্য একটা শব্দ পেলাম। বুঝলাম ভিতরে কিছু আলগা জিনিস আছে।

অবশেষে আমি বললাম, 'গুহার ভিতরে এর রহস্য উদ্ঘাটন সম্ভব হবে না। তুমি কি এটা আমাদের হোটেলে নিয়ে যেতে দেবে ? শুধু আজকের দিনের জন্য ? আমি কথা দিচ্ছি এর কোনও অবমাননা আমি করব না।'

অল্ হাব্বাল কিছুক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে বলল, 'জিগুরাৎ-এর দেবতার অলৌকিক শক্তিতে তোমার বিশ্বাস আছে ?'

আমি বললাম, 'প্রাচীন জিনিসের প্রতি আমার অসীম শ্রদ্ধা আছে, বিশেষত সে জিনিস যদি এত সুন্দর হয়।'

অল্ হাব্বাল একটু হেসে বলল, 'তাতেই হবে !'

তারপর আমাদের দিক থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে ফটকের দিকে মুখ করে তার সেই অদ্ভুত সুরেলা গলায় বলে উঠল—'চিচিং ফাঁক।'

চোখের সামনে দেখতে দেখতে আবার সেই ঘরঘর শব্দ করে পাথরের ফটক ফাঁক হয়ে দিনের আলো এসে গুহায় প্রবেশ করল। আমরা বাইরে বেরিয়ে গিয়ে হাঁপ ছাড়লাম।

অল্ হাব্বালের লাঞ্চ বাস্কেট থেকে চমৎকার ফল মিষ্টি পাঁউরুটি ও চিজ খেয়ে প্রায় সন্ধ্যা সাতটার সময় সেই অদ্ভুত বাক্স নিয়ে আমরা হোটেলে ফিরলাম। গোল্ডস্টাইন এখনও গজর গজর থামায়নি। আমরা যে অল্ হাব্বালের কথায় কান দিয়েছি, তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছি, তার বাক্সের রহস্য উদ্ঘাটনের ভার নিয়েছি—এর কোনওটাই যেন সে বরদাস্ত করতে পারছে না। হোটেলের ভিতর ঢুকে সে আমাদের সামনেই অল্ হাব্বালকে বলল, 'যদি বুঝতে পারি তুমি আমাদের ধাপ্পা দিয়েছ তা হলে পুলিশে রিপোর্ট করব। তুমি যে চোর, সেটা নিজেই স্বীকার করেছ—সুতরাং তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি পাইয়ে দিতে আমাদের কোনও

অসুবিধে হবে না। একথা যেন মনে থাকে।'

অল্ হাব্বাল হেসে বলল, 'বিরাশি বছর বয়সে আর কী শাস্তি দেবে তোমরা? আমার জীবনের শুধু একটি সাধই মিটতে বাকি আছে, সেটা হল ওই বাক্সের গুণ কী সেটা জানা। এটা জানতে পারলেই আমার মোক্ষ। তারপর আমি মরি কি বাঁচি, আমার শাস্তি হয় কি না হয় সে সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র উদ্বেগ বা কৌতূহল নেই।'

তারপর আমার দিকে ফিরে সে বলল, 'তোমাদের পক্ষে আমার খোঁজ করা মুশকিল হবে কারণ আমার টেলিফোন নেই। আমি নিজেই কাল সকালে এসে দেখা করব।'

এই বলেই আমাদের তিনজনকে কুর্নিশ করে অল্ হাব্বাল হোটেলের দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাইরের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এখন বেজেছে রাত সাড়ে দশটা। গত দুঘণ্টা ধরে আমি আর পেত্রুচি আমার ঘরে বসে বাক্সটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে কেবল একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি। এটার গায়ে বসানো অনেকগুলো পাথরের মধ্যে একটা বেশ বড় কার্নেলিয়ান পাথর রয়েছে যেটা প্যাঁচ দিয়ে বসানো। অর্থাৎ, সেটাকে খোলা যায়। পাথরটাকে খুলেওছি আমরা, আর খুলে দেখেছি যে পাথরটার পিছনে একটা ছোট্ট কৌটোর মতো জিনিস রয়েছে। সেটার রং কালো। গন্ধ শুঁকে মনে হল সেটায় প্যারাফিন বা মোম জাতীয় কোনও জিনিস জ্বালানো হয়েছে, যার ফলে ওটার রং কালো হয়ে গিয়েছে। ইচ্ছে ছিল ওখানে একটা সলতে দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেখা—কিন্তু এতরাত্রে প্যারাফিন জাতীয় জিনিস কোথায় পাব? কাল সকালে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম জোগাড় করে আবার পরীক্ষা করে দেখা যাবে।

গোল্ডস্টাইন একবারও আমার ঘরে আসেনি। ওকে ফোন করেছিলাম। বলল ওর শরীর ভাল নেই—মাথায় এবং পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে। জিগুরাৎ-এর দেবতার যদি সত্যিই কোনও অলৌকিক ক্ষমতা থেকে থাকে, তা হলে হয়তো সে এরমধ্যেই গোল্ডস্টাইনের উপর অভিশাপ বর্ষণ করতে শুরু করেছে, এবং তার ফলেই তার শরীর খারাপ! কে জানে!

২১শে নভেম্বর, সকাল সাড়ে ছ'টা

আজ এই অল্প কিছুক্ষণ আগে যে আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটে গেল সেটা এইবেলা লিখে রাখি।

আমি এমনিতেই খুব ভোরে উঠি, গিরিডিতে রোজ পাঁচটায় উঠে আমি উশ্রীর ধারে বেড়াতে যাই। আজ মনে একটা উত্তেজনার ভাব থাকার দরুনই বোধ হয় আরও সকালে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। মুখ ধুয়ে স্নান করে কফি খেয়ে যখন জানালাটার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, তখন আকাশ ফরসা হয়ে গেছে। সারা আকাশময় তুলো-পেঁজা মেঘ; তাতে রঙের খেলা দেখতে দেখতে গতকালের আরব্যোপন্যাসের গুহার কথা ভাবছিলাম। আর ভাবছিলাম জাদুমন্ত্র 'চিচিং ফাঁক'-এর কথা। ভাবতে ভাবতে কখন যে গলা দিয়ে মন্ত্রটা নিজেই উচ্চারণ করে ফেলেছি তা জানি না। একবার নয়—বার তিনেক অন্যমনস্ক ভাবে 'চিচিং-ফাঁক' কথাটা বলার পর হঠাৎ একটা খটাং শব্দ শুনে চমকে পিছনে ফিরে দেখতে হল।

বাক্সটা আমার খাটের পাশের টেবিলের উপর রাখা ছিল। এখন সেটার দিকে চেয়ে দেখি তার এক পাশের একটা অংশ ফাঁক হয়ে দরজার মতো খুলে গিয়েছে। অবাক হয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখি, একটা আধুলির সাইজের ল্যাপিসল্যাজুলি পাথর, ঠিক যেমন ভাবে দরজা খুলে যায়, সেইভাবে খুলে গিয়ে একটা ছোট্ট কবজার সঙ্গে আটকানো অবস্থায় ঝুলে আছে। আশ্চর্য—গুহা এবং বাক্স খোলার জন্য একই সংকেত, কেবল বলার সুরে সামান্য একটু

www.BDeBooks.Com

তফাত।

খুলে যাওয়া দরজাটার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারলাম। ভিতরে এক অদ্ভুত ব্যাপার। অত্যন্ত ছোট ছোট সব যন্ত্রপাতি জাতীয় জিনিস দিয়ে ভিতরটা ভরা। তারমধ্যে ধাতুর তৈরি জিনিস তো আছেই—তাছাড়া আছে পুঁতি বা কাচের টুকরো জাতীয় জিনিস। সেগুলো যে কী, সেটা বোঝা ভারী মুশকিল, কারণ এরকম যন্ত্রপাতি এর আগে কখনও দেখিনি। আমার অমনিস্কোপ মাইক্রোস্কোপ হিসাবে ব্যবহার করেও বিশেষ লাভ হল না—আমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেলাম।

বাক্সটাকে তুলে জানালার কাছে এনে দিনের আলোতে এই প্রথম সেটাকে ভাল করে দেখলাম। যেদিকটায় কার্নেলিয়ান পাথরটা প্যাঁচ দিয়ে লাগানো ছিল, তার ঠিক উলটো দিকটায় এবার লক্ষ করলাম একটা ছোট্ট ফুটো রয়েছে। অম্‌নিস্কোপ চোখে লাগিয়ে বুঝলাম তার ভিতরেও একটা পাথর বসানো রয়েছে। হিরে কি ? তাই তো মনে হচ্ছে—তবে এটার যে কী ব্যবহার সেটা ধরতে পারলাম না।

এখন যেটা আসল দরকার সেটা হল বাক্সর ভিতরের বাতিটা জ্বালানো। পেত্রুচি বলেছে সকালে দোকানপাট খুললেই প্যারাফিন সংগ্রহ করে আনবে। তারপর বাক্সর ভিতরের প্রদীপটা জ্বালালে হয়তো এর রহস্য উদ্ঘাটন হতে পারে। আমি জীবনে অনেক উদ্ভট যন্ত্রপাতি ঘেঁটেছি—কিন্তু এরকম মাথা-গুলোনো জিনিস এর আগে কখনও আমার হাতে পড়েনি।

২২শে নভেম্বর, রাত আটটা

ধন্য হারুণ-অল্‌-রশিদের বাগদাদ ! ধন্য সুমেরীয় সভ্যতা ! ধন্য বিজ্ঞানের মহিমা ! ধন্য গেমাল নিশাহির অল্‌ হারারিৎ !

আমার এ উল্লাসের কারণ আর কিছুই না—আজ একটি এমন বৈজ্ঞানিক প্রতিভার পরিচয় পেয়েছি যার কাছে আমাদের কৃতিত্ব একেবারে ম্লান হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আমি তো ঠিক করেছি এখান থেকে যাবার আগে টাইগ্রিসের জলে আমার অম্‌নিস্কোপটা ফেলে দিয়ে যাব। গিরিডিতে ফিরে গিয়েও কাজে উৎসাহ কবে কীভাবে ফিরে পাব জানি না। আনন্দ, বিস্ময়, হতাশা এবং তার সঙ্গে কিছুটা রোমাঞ্চ ও আতঙ্ক মিলে মনের অবস্থা এমন হয়েছে যেমন এর আগে আর কখনও হয়নি। ...

কাল সকালে ড্রায়রি লিখে শেষ করার আধ ঘণ্টার মধ্যেই অল্‌ হাব্বাল টেলিফোন করেছিল। বলল, 'কী রকম বুঝছ ? রহস্য উদ্ঘাটন হল ?'

আমি সকালের ঘটনাটা বলতেই ও ভারী উত্তেজিত হয়ে বলল, 'আমি এক্ষুনি আসছি। সঙ্গে করে প্যারাফিন নিয়ে আসছি। পেত্রুচিকে বলে দাও ও যেন আর কষ্ট করে বাজারে না যায়।'

আমরা তিন বৈজ্ঞানিক একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট করলাম। গোল্ডস্টাইনের চেহারা দেখে মোটেই ভাল লাগল না। ও শুধু এক-পেয়ালা কফি খেল। বলল, 'কাল রাত্রে মোটেই ঘুম হয়নি—আর যেটুকু ঘুমিয়েছি, তারমধ্যে সব বিশ্রী বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি।'

পেত্রুচি একটা ঠাট্টা করে জিগুরাৎ-এর দেবতার অভিশাপের কথা বলতেই গোল্ডস্টাইন রীতিমতো বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোমাদের কুসংস্কারের নমুনা দেখে আর তোমাদের বৈজ্ঞানিক বলতে ইচ্ছে করে না। আমার শরীর খারাপের একমাত্র কারণ কাল ওই বিদঘুটে গুহায় অতক্ষণ বন্ধ অবস্থায় থাকা। এ ছাড়া আর কোনও কারণ নেই, বা থাকতেও পারে না।'

ওর অন্য কিছু করার ছিল না বলেই বোধ হয় শেষপর্যন্ত যখন অল্ হাব্বাল প্যারাফিন নিয়ে আমাদের ঘরে হাজির হল, গোল্ডস্টাইনও দেখি তার সঙ্গে সঙ্গে এসে ঘরের সোফাটায় ধুপ করে বসে পড়ল। বাইরের লোক যাতে হঠাৎ এসে না পড়ে, তাই ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আমরা আমাদের কাজে লেগে পড়লাম।

প্রথমে কার্নেলিয়ান পাথরটা প্যাঁচ দিয়ে খুলে পিছন থেকে কৌটোটা বার করে তাতে প্যারাফিন ভরলাম। তারপর আমার একটা রুমাল ছিঁড়ে সেটা দিয়ে একটা সলতে পাকিয়ে প্যারাফিনে চুবিয়ে দিয়ে তার ডগাটায় আগুন ধরিয়ে দিলাম। গোল্ডস্টাইন আমাদের ঠিক সামনেই বসেছিল। সলতেটায় আগুন দিয়ে কৌটোটা ভিতরে ঢোকাতেই দেখি কোত্থেকে জানি একটা আলো এসে গোল্ডস্টাইনের গায়ে পড়ল। এটা কীরকম হল ?

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমার ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা কেটে গিয়ে মনে পড়ল বাক্সটার সামনের দিকে ছোট্ট পাথরটার কথা।

স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে পাথরটা একটা লেন্স-এর কাজ করছে ; ভিতরে প্রদীপটা জ্বালানোর ফলে লেন্সের ভিতর দিয়ে আলো বেরিয়ে সেটাই গোল্ডস্টাইনের গায়ে পড়ছে।

অল্ হাব্বালের চোখ দেখি জ্বলজ্বল করছে। গোল্ডস্টাইনেরও কেমন জানি থতমত ভাব। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে একপাশে সরে গেল। অল্ হাব্বাল দৌড়ে গিয়ে সোফাটাকে একপাশে টেনে সরিয়ে দিল। তার ফলে তার পিছন দিকে যে দেয়ালটা বেরোল, আলোটা স্বভাবতই তারই উপর পড়ল। এবার বুঝলাম আলোর শেপটা একটা টর্চের আলোর মতো বৃত্তাকার।

পেত্রুচি হঠাৎ তার মাতৃভাষায় চেঁচিয়ে উঠল—'লা লানতের্না মাজিকা !'

অর্থাৎ ম্যাজিক ল্যানটার্ন। কিন্তু ছবি কই ?

সকালে 'চিচিং ফাঁক' বলার ফলে যে পাথরটা দরজার মতো খুলে গিয়েছিল—এবারে সেটার দিকে দৃষ্টি দিলাম। দরজা এখনও খোলাই রয়েছে। অতি সাবধানে আমার ডান হাতের তর্জনীটা তার ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করতেই একটা পেনসিলের ডগার মতো জিনিস অনুভব করলাম। সেটায় অল্প একটু চাপ দিতেই একটা অভাবনীয় জিনিস ঘটে গেল, যেটার কথা ভাবতে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে।

চাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাক্সটার ভিতর একটা আলোড়ন শুরু হল—যেন নানারকম যন্ত্রপাতি ভিতরে চলতে শুরু করেছে। দেয়ালের দিকে চেয়ে দেখি সেই গোল আলোটার ভিতর যেন একটা স্পন্দন শুরু হয়েছে। তারপর আলোর উপর সব বিচিত্র নকশা প্রতিফলিত হতে শুরু করল।

পেত্রুচি দৌড়ে গিয়ে আমার ঘরের জানালাটা বন্ধ করে দিল। ঘর এখন অন্ধকার—একমাত্র বাক্স থেকে বেরোনো আলো ছাড়া আর কোনও আলো নেই।

আর দেয়ালে ? স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখলাম যে দেয়ালে সিনেমা হচ্ছে— বায়স্কোপ—চলচ্চিত্র ! ছবি অস্পষ্ট—কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয় না। আর সে ছবি চলমান ছবি। আজকের সিনেমার সঙ্গে তার কোনওই তফাত নেই—কেবল ছবি চৌকোর বদলে গোল।

কিন্তু এসব কীসের ছবি দেখছি আমরা ? কোন শহরের দৃশ্য এটা ? এই লোকজন সব কারা ? এত ভিড় কেন ? কীসের উৎসব হচ্ছে ?

পেত্রুচি চেঁচিয়ে উঠল—'শবযাত্রা ! কোনও বিখ্যাত লোক মারা গেছে। ওই দেখো তার কফিন !'

সত্যিই তো। আর কফিনের পিছনে বয়ে চলেছে জনতার স্রোত। কত লোক হবে ? দশ হাজার ? অদ্ভুত এইসব লোকের পোশাক—অদ্ভুত তাদের চুলের বাহার ! লক্ষ করলাম

www.BDeBooks.Com

যে অনেকের হাতেই একরকম কারুকার্য করা হাতপাখা রয়েছে যেটা তারা সবাই একসঙ্গে নাড়ছে। আরও দেখলাম—ভিড়ের মধ্যে অনেকগুলো চারচাকার গাড়ি। সেগুলো টেনে নিয়ে চলেছে গোরুজাতীয় এক ধরনের জানোয়ার।

পেত্রুচি আবার চেঁচিয়ে উঠল—'বুঝেছি! উর! উর দেশের কোনও রাজা মারা গেছে। এদের কোনও রাজা মরলে সঙ্গে সঙ্গে আরও ৬০-৭০ জন লোককে বিষ খেয়ে মরতে হত। আর সবাইকে একসঙ্গে কবর দেওয়া হত!'

আমি যেন আর দেখতে পারছিলাম না। আমার মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করেছিল। আমি টেবিলের পাশ থেকে সরে গিয়ে খাটের উপর বসে পড়লাম। চার হাজার বছর আগের এই বায়স্কোপ আমার মাথা একেবারে গণ্ডগোল করে দিয়েছিল।

ছবি কতক্ষণ চলেছিল জানি না। হঠাৎ দেখলাম আবার ঘরের বাতি জ্বলে উঠল, আর অল্ হাব্বাল ফুঁ দিয়ে বাক্সর বাতিটা নিভিয়ে দিল। তার চোখে মুখে এমন এক অদ্ভুত ভাব, সে যেন কী বলবে কী করবে সেটা ঠিক বুঝতে পারছে না। এদিকে আমরা তিন বৈজ্ঞানিক একেবারে অভিভূত—আমাদের মুখ দিয়েও কোনও কথা সরছে না।

অবশেষে অল্ হাব্বালই প্রথম কথা বলল। দুহাত জোড় করে আমাদের তিনজনের দিকে কুর্নিশ করে সে বলল, 'আমি যে তোমাদের কী ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাব তা বুঝতে পারছি না। আমার জীবনের শেষ বাসনা তোমরা পূর্ণ করেছ। আমাদের দেশের প্রাচীন সভ্যতার একটা অত্যাশ্চর্য নমুনা যে তোমাদের দেখাতে পেরেছি, তার জন্য আমি কৃতার্থ। তবে শুধু একটা কথা—এই যন্ত্রটির কথা তোমরা প্রকাশ করবে না। করলেও তোমাদের কেউ বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না। ডক্টর গোল্ডস্টাইন আমাকে ভণ্ড বলেছিলেন, তোমাদের লোকে বলবে পাগল। আর প্রমাণও তো তোমরা দিতে পারবে না, কারণ বাক্সটা গত চার হাজার বছর যেখানে ছিল, ভবিষ্যতেও সেখানেই থাকবে। আমি তা হলে আসি! সেলাম আলেইকুম!'

অল্ হাব্বাল সঙ্গে করে তার বেতের লাঞ্চ বাস্কেটটা নিয়ে এসেছিল; তার মধ্যেই বাক্সটা ভরে নিয়ে সে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

কিছুক্ষণ তিনজনেই বোকার মতো চুপ করে বসে রইলাম। তারপর পেত্রুচি গোল্ডস্টাইনের দিকে ফিরে বলল, 'তোমার এখনও মনে হয় লোকটা ভণ্ড?'

গোল্ডস্টাইনকে দেখে মনে হল সে থতমত ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে। তার মাথায় যেন অন্য কোনও চিন্তা খেলছে—তার চোখ জ্বলজ্বল করছে। সে এতক্ষণ চেয়ারে বসেছিল, এবার উঠে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অসহিষ্ণুভাবে পায়চারি করে হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বলল, 'এমন একটা জিনিস এই গুহার মধ্যে বন্ধ পড়ে থাকবে? এ হতেই পারে না!'

গোল্ডস্টাইনের কথা আমার মোটেই ভাল লাগল না। বললাম, 'সেরকম অনেক আশ্চর্য প্রাচীন জিনিসও তো এখনও মানুষের অগোচরে মাটির নীচে লুকিয়ে আছে। ধরে নাও, আজকের ঘটনাটা ঘটেইনি।'

'অসম্ভব!' গোল্ডস্টাইন গর্জন করে উঠল। 'লোকটা যে চোর সে বিষয়ে তো কোনও সন্দেহ নেই। পাথরটাও তো ও চুরিই করেছিল। ওই বাক্সর উপর ওর কোনও অধিকার নেই। ওটা আমার চাই। ওটা আমি আদায় করে ছাড়ব—তাতে যত টাকা লাগে লাগুক। টাকার আমার অভাব নেই।'

আমরা কোনওরকম প্রতিবাদ করার আগেই গোল্ডস্টাইন ঝড়ের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

পেত্রুচি গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'ভুল করল...গোল্ডস্টাইন ভুল করল। ব্যাপারটা

আমার মোটেই ভাল লাগছে না।'

কিছুক্ষণ পায়চারি করে পেত্রুচিও নিজের ঘরে চলে গেল। আমি যে ভাবে খাটের উপর বসেছিলাম, সেইভাবেই আরও অনেকক্ষণ বসে রইলাম। চার হাজার বছর আগের উরের মৃত সম্রাটের শবযাত্রার দৃশ্য তখনও চোখের সামনে ভাসছে। সুদূর অতীতেও মানুষের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি যে কতদূর অগ্রসর হয়েছিল, সেটা আজ যেমনভাবে টের পেয়েছি, তেমন আর কোনওদিন পাইনি।

বিকেলের দিকে পেত্রুচি ফোন করে জানিয়েছে যে গোল্ডস্টাইন তখনও ফেরেনি। আধঘণ্টা আগে আমিও তার ঘরে একবার ফোন করেছিলাম—কোনও উত্তর পাইনি। রাত হয়ে গেল। এখন আর কিছু করার উপায় নেই। কাল সকাল পর্যন্ত দেখি। জিগুরাৎ-এর দেবতা ইশতারের কথা মনে করে গোল্ডস্টাইনের জন্য রীতিমতো ভয় হচ্ছে।

২৩শে নভেম্বর

বাগদাদের আশ্চর্য অভিজ্ঞতার যে এমন অদ্ভুত পরিসমাপ্তি হবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। অতিরিক্ত লোভের যে কী পরিণাম হতে পারে তার একটা ভাল নমুনা দেখা গেল! অবিশ্যি আমি না থাকলে আরও বেশি বিপর্যয় ঘটতে পারত সেটা ভেবেই যা সামান্য একটু সান্ত্বনা।

আজ ভোরে উঠেই টেলিফোন করে জানতে পারলাম যে গোল্ডস্টাইন রাত্রে হোটেলে ফেরেনি। খবরটা পেয়ে তৎক্ষণাৎ পেত্রুচির সঙ্গে যোগাযোগ করে স্থির করলাম যে আমাদের একটা কিছু করতে হবে। দুজনেই বুঝেছিলাম যে আমাদের আবার গুহাতেই ফিরে যেতে হবে। অল্ হাব্বাল সেখানেই গেছে, আর গোল্ডস্টাইনও নির্ঘাৎ তাকে ধাওয়া করতেই বেরিয়েছিল।

হোটেলের ম্যানেজার মিঃ ফারুকিকে বেড়াতে যাবার কথা বলতেই তিনি একটা গাড়ির বন্দোবস্ত করে দিলেন। ঠিক সাড়ে ছটার সময় আমি আর পেত্রুচি গুহা অভিমুখে যাত্রা করলাম।

৭০ মাইল পথ যেতে ঘণ্টা দেড়েক সময় লাগল। যেখানে গতবার অল্ হাব্বাল গাড়ি থামিয়েছিল, এবারও সেখানেই ড্রাইভারকে গাড়িতে অপেক্ষা করতে বলে আমরা দুজনে গুহার দিকে রওনা হলাম।

গুহায় পৌঁছে দেখি ফটক বন্ধ। আমি এটাই আশা করেছিলাম, কিন্তু পেত্রুচিকে দেখে মনে হল সে মুষড়ে পড়েছে। বলল, 'বৃথাই আসা হল। বোধ হয় ডাইনামাইট দিয়ে ভেঙে ফটক খোলা ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই।'

আমি বললাম, 'তার আগে আমার স্মরণশক্তিটা একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই।'

পেত্রুচি অবাক হয়ে বলল, 'তুমি বলতে চাও অল্ হাব্বাল-এর সুর তুমি হুবহু নকল করতে পারবে?'

উত্তরে আমি আমার হাত দুটোকে মুখের সামনে চোঙার মতো করে ধরে আমার গলাটাকে আমার স্বাভাবিক পর্দার চেয়ে বেশ কয়েক ধাপ উপরে তুলে বলে উঠলাম, 'চিচিং ফাঁক!'

কয়েক মুহূর্ত কিছু হল না। তারপর গম্ভীর মেঘের গর্জনের মতো একটা শব্দ শুরু হল। আমার পাশেই একটা গিরগিটি ভয় পেয়ে লেজ তুলে ঘাসের উপর দিয়ে সড় সড় করে পালাল। দেখলাম, গুহার ফটকটা আস্তে আস্তে খুলে গিয়ে পিছনের হাঁ করা অন্ধকার দেখা যাচ্ছে।

খোলা শেষ হলে আমরা দুজনে দুরু দুরু বুকে গুহার ভিতরে প্রবেশ করলাম।

www.BDeBooks.Com

আমাদের দুজনের সঙ্গে টর্চ ছিল। আলো জ্বালতেই প্রথম দুপাশে তাকের উপর জিনিসপত্রের গায়ে রং-বেরঙের পাথরের চমকানি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। তারপর মাঝখানে যে পাথরের উপর বাক্সটা রাখা ছিল, সেখানে টর্চ ফেলে দেখি জায়গাটা খালি। বাক্সের কোনও চিহ্নমাত্র নেই।

পেত্রুচি ইতিমধ্যে কোণের দিকটায় এগিয়ে গিয়েছিল ; হঠাৎ তার অস্ফুট চিৎকার শুনে আমিও সেইদিকে ধাওয়া করে গেলাম।

পেত্রুচির টর্চের আলো মাটির উপর ফেলা। সেই মাটির উপর চিত হয়ে চোখ-চাওয়া অবস্থায় পড়ে আছে গোল্ডস্টাইন!

এবার আমার টর্চের আলো ফেলতেই গুহার কোণের সমস্তটা আলোয় ভরে গেল। তার ফলে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে রক্ত হিম হয়ে গেল।

গোল্ডস্টাইনের হাত তিনেক পিছনে পড়ে আছে অল্ হাব্বাল্ ; সেও চিত হয়ে শোওয়া, তার বুকের উপর দুহাত দিয়ে জাপটে ধরা চার হাজার বছরের পুরনো বায়স্কোপের বাক্স ; আর তার ঠিক পাশে পড়ে আছে গেমাল নিশাহিরের কঙ্কাল—যেমন ভাবে আগে দেখে গেছি, ঠিক তেমনি ভাবেই।

গোল্ডস্টাইনের নাড়ি পরীক্ষা করে হাঁপ ছাড়লাম। সে এখনও মরেনি—তবে তার অবস্থা সঙ্গীন—এক্ষুনি তাকে গুহার ভেতর থেকে বার করে নিয়ে তার চিকিৎসা করতে হবে।

আর অল্ হাব্বাল্? তার জীবন শেষ হয়ে গেছে। সম্ভবত কাল থেকেই সে মৃত—কারণ বাক্সটা তার হাত থেকে ছাড়াতে গিয়ে দেখলাম সেটা আলগা করার কোনও উপায় নেই—তার অসাড় হাত দুটো চিরকালের মতো বাক্সটাকে বন্দি করে ফেলেছে।

* * *

গোল্ডস্টাইনকে হোটেলে ফিরিয়ে এনেছি এই ঘণ্টাখানেক হল। তার জ্ঞান হয়েছে। ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে বলেছে তার মধ্যে শারীরিক কোনও গণ্ডগোল নেই। কিন্তু আমরা জানি যে তার মধ্যে একটা বিশেষ রকম কোনও পরিবর্তন ঘটে গেছে—কারণ তাকে কালকের ঘটনার কথা জিজ্ঞেস করতেই সে একগাল হেসে বলল—'চিচিং ফাঁক!'

তারপর থেকে এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত তাকে যত প্রশ্নই করা হয়েছে—সবক'টারই উত্তরে সে ওই এক ভাবেই হেসে বলেছে, 'চিচিং ফাঁক!'

সন্দেশ। ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৬